সুলতান সালাহউদ্দীন

ডঃ এম. আবদুল কাদের

সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন

ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
এর পক্ষে
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

সুলতান সালাহ্উদ্দীন
ডঃ এম, আবদুল কাদের

ইসাকেচা প্রকাশনা ৮৭
ইফা প্রকাশনা ৮১৩

প্রকাশক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে
হাস্নাইন ইমতিয়াজ
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা-২

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৪০
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮১
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ ঃ রজব ১৪০১

মুদ্রক
কে, এম, আমান উল্লাহ
নাটোর প্রেস লিমিটেড
৮৯ যোগীনগর রোড
ওয়ারী, ঢাকা-৩

বাঁধাইকার
সমতা বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২১ প্রসন্ন পোদ্দার লেন
তাঁতীবাজার, ঢাকা-১

মূল্য ঃ পনেরো টাকা মাত্র

SULTAN SALAHUDDIN (Life-sketch of Ghazi Sultan Salahuddin : A Great Muslim Hero) : Written by Dr. M. Abdul Quader in Bengali and published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Dacca-2 on behalf of Islamic Foundation, Bangladesh. Second Edition : June 1981.

Price : Taka 15·00 (Inland) U S $ 2·00 (Foreign)

সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন

সূচীপত্র

পরিচয় ১।। সেকালের দুনিয়া ৪ ।। মুক্তিদূত ৭।। বালক সালাহ্উদ্দীন ১০।। মিসর জয় ১৪ ।। উজীর সালাহ্উদ্দীন ২০।। সালাহ্উদ্দীনের কায়রো ২৬ ।। দিগ্বিজয় ৩১।। সিরিয়া জয় ৩৫।। স্বাধীন সুলতান ৩৯ ।। গুপ্তঘাতকের দেশে ৪৩।। প্যালেস্টাইন অভিযান ৪৬ ।। মেসোপটেমিয়া জয় ৫২।। প্যালেস্টাইন আক্রমণ ৫৮।। মসুল অভিযান ৬২ ।। হিত্তিনের যুদ্ধ ৬৫।। প্যালেস্টাইন জয় ৭১।। জেরুজালেম পুনরধিকার ৭৫ ।। টায়ার অবরোধ ৮০।। উত্তরাঞ্চলে অভিযান ৮৪।। একরের যুদ্ধ ৮৭।। একর অবরোধ ৯৭।। একরের পতন ১০০।। রিচার্ড ও বার্গাণ্ডীর ডিউকের বর্বরতা ১০৫।। আর্সাফের যুদ্ধ ১০৯ ।। সন্ধির উদ্যোগ ১১৩।। জাফ্ফার যুদ্ধ ১১৯ ।। রমলার সন্ধি ১২৪ ।। ইন্তেকাল ১২৯ ।। রাজর্ষি সালাহ্-উদ্দীন ১৩৩ ।। মহামতি সালাহ্উদ্দীন ১৪০ ।। ইতিহাসে সালাহ্উদ্দীন ১৪৪।। রোমান্সে সালাহ্উদ্দীন ১৪৮ ।। দীক্ষা-রহস্য ১৫৪ ।।

আমাদের কথা

ইসলামের ইতিহাসে গাজী সালাহ্উদ্দীন একটি অমর নাম। ক্রুসেডরত সমগ্র খৃস্টান ইউরোপের মোকাবিলায় মুসলিম শৌর্যবীর্যের প্রতীক হিসাবে শত শত বছর ধরে মুসলিম জনগণ যে একটি ব্যক্তিকে প্রাণের সবটুকু শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আবেগ অনুভূতি দিয়ে স্মরণ করে আসছে, তিনিই সালাহ্উদ্দীন। আমাদের ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে সালাহ্উদ্দীন যে অসামান্য বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সমরকুশলতার পরিচয় দেন, তা এক কথায় দুর্লভ। কিন্তু সালাহ্-উদ্দীন শুধু একজন বীর সেনাপতি বা রাষ্ট্রবিদ মাত্র ছিলেন না—ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খৃস্টান ইউরোপকে মহত্ত্বের যুদ্ধেও তিনি সমভাবে পরাজিত করেছিলেন। সালাহ্উদ্দনীকে যে ইউরোপ "সালাহ্উদ্দীন দি গ্রেট" উপাধি দিয়েছে, তাও তাৎপর্যহীন নয়।

একই সাথে ইসলামের শৌর্যবীর্য ও উদারতার এহেন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আজকের দিনে জাগরণমুখী ইসলামের মোকাবিলায় ইউরোপসহ বিভিন্ন বিরুদ্ধশক্তি যেভাবে ইসলামবিরোধী ক্রুর চক্রান্তে মেতে উঠেছে, তাতে গাজী সুলতান সালাহ্উদ্দীনের মত বীর ও মহান নায়কের আদর্শ আমাদের তরুণ সমাজকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করতে পারবে বলে আমরা মনে করি। মুসলিম ইতিহাসের এহেন গৌরবজনক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাংলাভাষায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পুস্তক "সুলতান সালাহ্উদ্দীন" রচনা করেছিলেন ডঃ এম, আবদুল কাদের। বিভাগপূর্ব যুগের প্রকাশিত সেই গ্রন্থের নতুন সংস্করণ এতদিনে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র দরবারে আন্তরিক শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা ২৫ মে ১৯৮১

আবদুল গফুর
প্রকাশন-পরিচালক

পরিচয়

১১৩২ খৃস্টাব্দে একদিন একটি ছত্রভঙ্গ বাহিনী অকস্মাৎ তাইগ্রীস নদীর বাম তীরে উপনীত হইল। অপর তটে এক উন্নত শৈলোপরি দুর্ভেদ্য তেক্রিত দুর্গ অবস্থিত। সম্মুখে খরস্রোতা প্রবাহিনী, পশ্চাতে শোণিতলোলুপ শত্রু বাহিনী;—'জলে কুম্ভীর ডাঙ্গায় বাঘ।' এই উভয় সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দুর্গাধ্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত পালতক সৈন্যদলের গত্যন্তর ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে কিল্লাদার তাহাদের বিপদে ব্যথিত হইলেন। অবিলম্বে নদীতে খেয়া-নৌকার ব্যবস্থা হইল। পলাতকেরা অপর তীরে উঠিয়া নিরাপদে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। তাইগ্রীস নদীর এই খেয়া-নৌকা হইতেই সালাহ্উদ্দীনের বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। পলাতক সেনাপতি মসুলের শাসনকর্তা বিখ্যাত ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। জঙ্গী অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁহার সৌভাগ্যের দিন ফিরিয়া আসিলে তিনি অতীত উপকারের কথা স্মরণ করিয়া দুর্গাধিপতিকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই কিল্লাদার আইয়ুবই জগদ্বিখ্যাত সুলতান সালাহ্উদ্দীনের (Saladin the Great) জনক।

আইয়ুবের পূর্ণ নাম নজমুদ্দীন আইয়ুব। তিনি জাতিতে কুর্দ। আর্মেনিয়ার অন্তর্গত দবিন নগরীর নিকটবর্তী আজদানাকান গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার দূরবর্তী পূর্ব পুরুষদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিফ্লিস নগরীর সমৃদ্ধিলাভের বহু পূর্বে খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে দবিন বা দবিল নগরী উত্তর আর্মেনিয়ার রাজধানী ছিল। অধিবাসীরা প্রধানতঃ খৃস্টান ও ইহুদী ব্যবসায়ী। বাণিজ্যের কৃপায় তাঁহারা অতুল সম্পদের অধিকারী হয়। ইহুদী, খৃস্টান ও পারসিক পুরোহিতেরা বিজয়ী মুসলমানদের অধীনে তাঁহাদেরই ন্যায় সর্ববিধ নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া সুখে-শান্তিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। খৃস্টানের গির্জা ও মুসলমানের মস্জিদ পাশাপাশি দণ্ডায়মান থাকিয়া পরাজিত বিধর্মী জাতির প্রতি মুসলমানদের

উদারতার সাক্ষ্য দান করিত।* আইয়ুব পরিবার এই দবিল নগরীর এক অতি-বিখ্যাত ও সম্মানী বংশ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

সালাহ্উদ্দীনের পিতামহ সাদী ইব্নে মারওয়ানের সময় হইতেই দবিল নগরীর অবনতি আরম্ভ হয়। তৎকালে বাগদাদ নগর আব্ব সিয়া খলীফাদের রাজধানী ছিল। সাদীর বন্ধু বাহ্রোজ তখন উহার শাসনকর্তা। তাঁহার দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তিনি বন্ধু-পুত্র আইয়ুবকে তেক্রিত দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বলে নব-নিয়োজিত কিল্লাদার শীঘ্রই এই নিবাচনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা শের্কুর অবিবেচকতায় অচিরে তাঁহাদের সৌভাগ্যের দিন ফুরাইয়া গেল। কোন রমণীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া শের্কুহ্ এক দুর্বৃত্তের প্রাণ-বধ করেন। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর সহিত বাহ্রোজের সদ্ভাব ছিল না। আইয়ুব তাঁহার পলায়নে সাহায্য করায় তিনি পূর্ব হইতেই বন্ধু-পরিবারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। শের্কুর বে-আইনী কাজে তাঁহার ক্রোধ অ রও বর্ধিত হইল। আইয়ুব পদচ্যুত হইয়া সপরিবারে দুর্গ ত্যাগে আদিষ্ট হইলেন।

১১৩৮ খৃস্টাব্দের এক বিষাদ-রজনী। আইয়ুব চিন্তাকুল হৃদয়ে স্থানান্তর গমনের আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় তাঁহার এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। এই দুরবস্থার মধ্যে প্রসব হওয়ায় আইয়ুব উহাকে দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু "স্বর্গ-মর্তে একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন কেহই গায়েবের খবর জানে না।" যে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি পিতার ভ্রমণ-যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিল, সেই ইউসুফ-ই পরবর্তী-কালে নিজের অসাধারণ কীর্তি ও চরিত্র-মহিমায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সালাহ্উদ্দীন বা 'ধর্মের গৌরব' নামে বিখ্যাত হন। ইউরোপীয়রা এই সালাহ্ উদ্দীনকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া 'সালাদিন' এই পারি-বারিক নামে অদ্যাবধি তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিয়া আসিতেছে।

---

* Jews, Magians and Christians dwelt there in peace under their Mohammedan conquerors and Armenian Church stood beside the mosque where the Moslems prayed."—Stanely Lane-pool, M. A. Litt-D, Saladin, 5.

আইয়ুব কি সালাহ্‌উদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, না নূরজাহানের ন্যায় 'পথিমধ্যে পরিত্যাগ' (?) করিলেন, তাহা বর্ণনা করার পূর্বে মুসলিম জগতের যে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইস্‌লামের ভাবী মহানেতাকে তাঁহার ভাগ্য-গতি নিরূপণ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দান নিতান্ত প্রয়োজন।

সেকালের দুনিয়া

সালাহ্উদ্দীনের সময় খেলাফতের সে গৌরবের দিন আর ছিল না। উমাইয়া ও ফাতিমিয়াদের দেহাস্থির উপর আব্বাসিয়ারা তাঁহাদের সাম্রাজ্য-সৌধ গড়িয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু উহার প্রস্তরগুলি খসিয়া পড়িতে অধিক বিলম্ব হইল না। জনৈক উমাইয়া শাহ্জাদা * গোপনে পলাইয়া গিয়া স্পেনে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর ফাতিমিয়ারা মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় স্বতন্ত্র খিলাফৎ কায়েম করিলেন। এতদ্ব্যতীত খাস এশিয়ায়ও বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা আমীর মালিক বা সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া বসিলেন। ফলে আব্বাসিয়া খলীফাদের ক্ষমতা বাগদাদ ও উহার নিকটবর্তী স্থানেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল।

একাদশ শতব্দীর প্রায় মধ্যভাগে এশিয়ার এই শোচনীয় রাজনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইল। সেলজুক তুর্কেরা গজনভীদিগকে পরাজিত করিয়া পারস্যের অধিকাংশ নিজেদের দখলে আনিল। ক্রমে পশ্চিমে মিসর ও গ্রীক সীমান্ত পর্যন্ত তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। তাতার ও কিপ্চক হইতে অসংখ্য শ্বেত ক্রীতদাস আমদানী করিয়া সেলজুক সুলতানেরা তাহাদিগকে দেহরক্ষী এবং দরবার ও সাম্রাজ্যের বড় বড় পদে নিযুক্ত করিতেন। নগদ বেতনের পরিবর্তে তাঁহারা ভূ-সম্পত্তি জায়গীর পাইতেন। প্রতিদানে তাঁহাদিগকে যুদ্ধের সময় সুলতানকে সৈন্য ও রসদাদি দিয়া সাহায্য করিতে হইত। শীত ঋতুতে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যাইতেন, বসন্তের আগমনে আবার যুদ্ধে নামিতেন। মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও পারস্যের অধিকাংশ স্থানে এইরূপ অসংখ্য জায়গীরের সৃষ্টি হয়।

মালিক শাহের মৃত্যুর পর (১০৯২ খৃঃ) সেলজুক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। নিশাপুর, ইস্পাহান, কার্মান, দামেশ্ক, আলেপ্পো ও আনাতোলিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলজুক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাদের দুর্বলতার সুযোগে মাম্লুক বা ক্রীতদাস শাসনকর্তারা ক্রমে স্বাধীনতা

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমার 'স্পেনের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। মসুলের বিখ্যাত আতাবেক বংশের প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গী মালিক শাহের এইরূপ জনৈক দাসপুত্র; মেসোপটেমিয়ার অর্তুক এবং অন্যান্য বংশও ঠিক একইরূপে সৌভাগ্য শিখরে আরোহণ করেন। তাঁহারাও সেলজুকদের ন্যায়ই শিক্ষা-সভ্যতা বিস্তারে মন দেন। কিন্তু অন্তর্বিবাদ—বিশেষতঃ সর্বনাশা 'ক্রুসেড' তাঁহাদের সমস্ত জনহিতকর কার্যপণ্ড করিয়া দেয়।

মুসলিম জগত যখন এইরূপ শতধা বিচ্ছিন্ন, তখন খৃস্টানেরা সুযোগ বুঝিয়া সচল হইয়া উঠিল। যিশু-খৃস্টের সমাধি-ভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের অজুহাতে পোপ দ্বিতীয় আরবান ও সন্ন্যাসী পিটার 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পোপ প্রত্যেক ক্রুসেডার বা ধর্ম-যোদ্ধার পাপমুক্তির ভার লইলেন। ফলে সমগ্র ইউরোপ যেন সমূলে উৎপাটিত হইয়া এশিয়া মাইনরে আপতিত হইল। প্রথম অভিযানে তিন লক্ষ খৃস্টান বুলগেরিয়ার ইয়াহুদী ও রুমের সুলতানের হস্তে মৃত্যুবরণ করিলেও পরিণামে তাহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। ১০৯৮ হইতে ১১২৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে ফিলিস্তিন প্রদেশের অধিকাংশ ও সিরিয়া প্রদেশের সমুদ্র-তটভূমি খৃস্টানদের দখলে চলিয়া গেল। নব-প্রতিষ্ঠিত খৃস্টান রাজ্য উত্তরে-দক্ষিণে ৫০০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব-পশ্চিমে ন্যূনাধিক ৫০ মাইল প্রশস্ত ছিল। জেরুজালেমের রাজার অধীনে গ্যালিলী ও এন্টিওক এক এক জন প্রিন্স্, এডেসা ও জাফ্ফা-আস্কালন এক এক জন কাউন্ট্, সিদন ও করক-মন্ট্রিয়েল এক এক জন লর্ড উপাধিধারী শাসনকর্তার দ্বারা শাসিত হইত।

খৃস্টানদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার আরম্ভ হয়। মার্রাতুন্নোমান নগরে এক লক্ষ ও জেরুজালেমে সত্তর হাজার মুসলমান তাহাদের হস্তে মৃত্যুবরণ করে। আগুণ লাগাইয়া দিয়া তাহারা নিরপরাধ ইয়াহুদীদিগকে মন্দিরের মধ্যে পোড়াইয়া মারে। * প্রস্তর-প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ হইতে তাহারা প্রায়ই নিকটবর্তী মুসলিম জনপদ লুণ্ঠনে বাহির হইত। মুসলমানদের মধ্যে সীজার দুর্গাধ্যক্ষ ওসামা ও বিখ্যাত তুর্ক সেনাপতি ইলগাজী ব্যতীত

* '.. seventy thousand Moslems had been put to the sword, and the harmless Jews had been burnt in their synagogues..."—Gibbon, Decline and the fall of the Roman Empire, vol. vi, 336.

আর কেহই অনৈক্যের দরুণ খৃস্টানদের অগ্রগতি রোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়।' অবিশ্রান্ত অত্যাচারে অবশেষে মুসলমানদেরও ধৈর্য ফুরাইয়া গেল। ধর্মপ্রাণ তুর্কেরাই এই অমানুষিক জুলুম নিবারণে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইল। বিভিন্ন স্থানে তখনও সুশিক্ষিত তুর্ক সৈন্যদল বিদ্যমান ছিল। অভাব ছিল শুধু তাহাদিগকে একত্র করিয়া খৃস্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, এইরূপ একজন উপযুক্ত নেতার। অবশেষে যিনি এই অভাব পূরণ করেন তাঁহার নাম ইমাদুদ্দীন জঙ্গী।

মুক্তিদূত

মালিক শাহের বিখ্যাত মাম্‌লুক কর্মচারীদের মধ্যে মসুলের শাসনকর্তা অক্‌-সুঙ্কুর অন্যতম। ক্রুসেডের বিশ্রুতনামা বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইহারই পুত্র। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে (১০৯৪)। কিন্তু পরবর্তী শাসনকর্তারা তাঁহাকে সযত্নে প্রতিপালন করেন। সুলতান ও খলীফার পক্ষে ত্রিশটি যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি তাঁহার সুখ্যাতি বর্ধিত করেন। ১১২৪ খৃস্টাব্দে তিনি বসরা ও ওয়াসেত নগরীর জায়গীর পান এবং তিন বৎসর পরে মসুল ও জজিয়াঁর (মেসোপটেমিয়া) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত সুলতানের দুই পুত্রের শিক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই পদ-মর্যাদার গুণে তিনি আতাবেগ বা 'শাহ্‌জাদাদের শিক্ষক' এই সম্মানিত উপাধির অধিকারী হন। মসুল খৃস্টান সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এই সময় হইতে স্বভাবতঃই তাঁহাকে ইসলামের নেতারূপে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়।

রাজধানী হইতে দুই শত মাইল দূরে আসিয়া জঙ্গী স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য শাসনের সুযোগ পাইলেন। অবশ্য খৃস্টানদের সহিত শক্তি পরীক্ষার পূর্বে তাঁহাকে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইল। দিয়ার বকর অধিকার না করিলে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তজ্জন্য তিনি প্রথমে জজীরাত ইব্‌নে ওমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহার পতনের পর সিঞ্জার ও নিসিবিন তাঁহার দখলে আসিল। এডেসার কাউন্ট জোসেলিন তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস পাইলেন না। কাজেই জঙ্গী নির্বিবাদে সিরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। খৃস্টানদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া আলেপ্পোর অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে নগর ছাড়িয়া দিল (১১২৮)। এক বৎসর পরে সেলজুক সুলতান তাঁহাকে সমগ্র পাশ্চাত্য মুলুকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া এক বিশেষ সনদ প্রেরণ করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সুদৃঢ় আসারিব দুর্গ দখলে আনিলেন। খৃস্টানেরা জেরুজালেম রাজ বল্‌ডুইনের অধিনায়কতায় তাঁহাকে বাধা দিতে আসিয়া শোচনীয় রূপে পরাজিত হইল।

১১৩১ খৃস্টাব্দে সেলজুক সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া অন্তর্বিবাদ আরম্ভ হইল। এই গৃহ-যুদ্ধে যোগদান করিয়া জঙ্গী অনেকটা হীন-গৌরব হইয়া পড়িলেন। এই সময়ই তাঁহাকে তেক্রিত দুর্গাধ্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। জঙ্গীর ভাগ্য-বিবর্তনের সুযোগে খলীফা অল্-মুস্তারশিদ মসুল আক্রমণ করিলেন (১১৩৩)। কিন্তু তিন মাস ব্যর্থচেষ্টার পর তাঁহাকে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে হইল। এইরূপে বিপদমুক্ত হইয়া জঙ্গী পুনরায় সিরিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু দুইবার আক্রমণ করিয়াও দামেশ্ক অধিকার করিতে পারিলেন না। উজীর ময়নুদ্দীন আনার খৃস্টানদের সাহায্যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া জঙ্গী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। জেরুজালেম রাজ আবার পরাজিত হইয়া বেরিণ বা মন্ট্ফের্রাণ্ড দুর্গে পলাইয়া গেলেন। কিল্লাটি অজেয় বলিয়া খৃস্টানদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে অচিরে ইহা জঙ্গীর দখলে আসিল। রাজাকে তিনি এক প্রস্থ পোষাক উপহার দিলেন। সৈন্যেরা স্বসম্মানে দুর্গ ত্যাগের অনুমতি পাইল। তাঁহার মহত্ত্ব দেখিয়া খৃস্টানেরা অবাক্ হইয়া গেল।

এদিকে জঙ্গীর ক্ষমতা বিচূর্ণ করার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গ্রীক সম্রাট জন কমেনাস এক বিরাট বাহিনী লইয়া সিরিয়ায় হাজির হইলেন। নিকট-প্রাচ্যের খৃস্টান রাজন্যবর্গ, এমন কি দামেশ্ক রাজ পর্যন্ত তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। সুচতুর জন এক দিকে মিত্রতার ভাণ দেখাইয়া জঙ্গীর সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আর অপর দিকে তাঁহার সৈন্যেরা বীজা ও কাফারতাব অধিকার করিয়া সীজার অবরোধ করিল। জঙ্গীকে বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। ২৪ দিন পরে রোমান সম্রাট বিপুল রণ-সম্ভার মুসলমানদের হাতে ফেলিয়া রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন (১১৩৮)।

১১৩৯ খৃস্টাব্দে জঙ্গী দামেশ্ক-এর অধীন বা-আলবেক নগর অধিকার করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফ্র্যাঙ্ক * ও আনারের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধ-নীতির পরিবর্তন

* যে সকল ক্রুসেডার সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে, তাহাদিগকে ও তাহাদের বংশধরগণকে ফ্র্যাঙ্ক বলে।

করিতে হইল। তিনি কুর্দিস্তানের শাহরজুর ও আশিব দুর্গ অধিকার করিয়া আর্মেনিয়ার শাহ্ পরিবারের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ নিরাপদ করিয়া বীরবর জঙ্গী পুনরায় দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। দিয়ার বকর দখল করিয়া তাঁহার সৈন্যেরা আমিদ অবরোধ করিল। এডেসার কাউন্ট্ দ্বিতীয় জোসেলিন আতঙ্কে সিরিয়ায় পলাইয়া গেলেন। সংবাদ পাইয়া জঙ্গী ত্বরিত গতিতে এডেসার সম্মুখে হাজির হইলেন। এক মাস অবরোধের পর মুসলমানেরা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অধীন সরুজ ও অন্যান্য স্থান তাহাদের দখলে আসিল (১১৪৪)। এডেসা অধিকারের ফলে খৃস্টান রাজ্যের দৃঢ়তম অবলম্বন বিনষ্ট হইল। দুই বৎসর পরে জঙ্গী জাবর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই সময় তিনি এক রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক কৃতদাসের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার আরব্ধকার্য সম্পন্ন করার ভার তাহার পুত্র নূরুদ্দীন ও নূরুদ্দীনের সেনাপতি সালাহ্উদ্দীনের উপর পড়িল।

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমার মুসলিম কীর্তি, ১ম খণ্ড, ৫৩-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বালক সালাহ্‌উদ্দীন

তেক্রিত দুর্গ ত্যাগ করিয়া আইয়ুব নবজাত শিশু ও অন্যান্য পরিজন সহ মসুলে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গী তাঁহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া লইলেন। তাঁহারা বহু যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া অচিরে প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইলেন। ১১৩৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে বা-আল্‌বেক নগরী জঙ্গীর হস্তগত হইলে তিনি আইয়ুবকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এখানেই সালাহ্‌উদ্দীনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। আইয়ুব ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। কাজেই পুত্রের জীবন যে পিতার আদর্শে গঠিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? সেকালে আরবীই ছিল শিক্ষার বাহন। সুতরাং সালাহ্‌উদ্দীন স্বভাবতঃই কুরআন হাদীস এবং আরবী ব্যাকরণ, কবিতা, ধর্মতত্ত্ব ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইউসুফের বয়স নয় বৎসর না হইতেই জঙ্গীর অকাল মৃত্যু ঘটিল। এই সুযোগে দামেশ্‌করাজ বা-আল্‌বেক আক্রমণ করিলেন। আইয়ুব দেখিলেন, জঙ্গীর পুত্রেরা আত্মকলহে লিপ্ত। তাঁহাদের কাহারও নিকট আপাততঃ সাহায্য লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ দামেশ্‌ক অধিপতি তাঁহার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সসৈন্যে নগর-দ্বারে উপস্থিত। কাজেই তিনি আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিনিময়ে তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার ও বিস্তৃত জায়গীর প্রদত্ত হইল। অসাধারণ দক্ষতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ভাগ্যবান্ পুরুষ দামেশ্‌ক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে, কনিষ্ঠ শের্কুহ্ ও (শের-ই-কুহ্—পার্বত্য সিংহ) তখন স্বকীয় অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব বলে সুলতান নূরুদ্দীনের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া সেনাপতির পদে সমাসীন। জাবারের শোচনীয় দুর্ঘটনার পরে জঙ্গীর বিস্তৃত রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সায়ফুদ্দীন গাজী মসুলের ও কনিষ্ঠ নূরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আলেপ্পোর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বীরবর জঙ্গীর

দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই এডেসার আর্মেনীয় খৃস্টানগণের আহ্বানে দ্বিতীয় জোসেলিন এক রাত্রে (নভেম্বরে) নিদ্রিত তুর্ক সৈন্যগণকে আহত, নিহত বা বন্দী করিয়া নগর অধিকার করিয়া লন। কিন্তু রক্ষী সৈন্যেরা নূরুদ্দীনের আগমন পর্যন্ত অপূর্ব বীরত্বের সহিত দুর্গ রক্ষা করিল। তাঁহার উপস্থিতিতে জোসেলিন এডেসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বাসঘাতক আর্মেনিয়ান্দের অধিকাংশই পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া নিহত হইল। নূরুদ্দীন হতাবশিষ্ঠ নেমকহারামদিগকে ইউফ্রেটিসের তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন।

১১৪৯ খৃস্টাব্দের শেষে আবার এডেসা দখলের চেষ্টা করিতে গিয়া জোসেলিন ধৃত হইয়া আলেপ্পোর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। নয় বৎসর পরে সেখানেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার অকৃতকার্যতার ফলে এডেসার কাউন্টি ও উত্তর সীমান্তে ফ্র্যাঙ্কদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল। জার্মান সম্রাট কনরাড ও ফরাসী-রাজ সপ্তম লুই পরিচালিত সর্বনাশকর দ্বিতীয় ক্রুসেডের দরুন তাহারা আরও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। পোপ সেন্ট্ বার্ণার্ডের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা এডেসার অপমান বিমোচন করিতে এশিয়ায় পদার্পণ করিলেন (১১৪৮) দামেশ্ক-কএর মৃৎ-প্রাচীর তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিলনা। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গলির কোণ, ফলোদ্যানের অভ্যন্তর ও অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে শর-বৃষ্টি করিয়া মুসলমানেরা তাহাদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিল। নিরুপায় ক্রুসেডারেরা নাগরিকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ নগরবাসীরা তাহাদিগকে কৌশলে নদী ও ফলোদ্যান হইতে দূরে সরাইয়া নিল। ফলে খৃস্টান শিবিরে খাদ্য ও পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তদুপরি কূটবুদ্ধি আনার ফ্র্যাঙ্কদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, জেরুজালেম রাজ্য অধিকারই ইউরোপীয় খৃস্টানদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, দামেশ্ক অবরোধ উহার মুখবন্ধ মাত্র। ইহাতে আস্থা স্থাপন করিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। এমতাবস্থায় রাজদ্বয়কে বাধ্য হইয়াই নূতন অপমান ঘাড়ে লইয়া ১১৪৯ খৃস্টাব্দের প্রথমে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এই নিরর্থক যুদ্ধে ইউরোপের দুর্গ ও নগরগুলি প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়।

* Sir G. W. Cox, Bart, M. A. Crusades, 93.

১১৪৯ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে অজেয় আনার পরলোক গমন করিলে আইয়ুব তাঁহার স্থানাধিকারী হইলেন। নূরুদ্দীন দেখিলেন, দামেশ্‌ককে কেন্দ্র করিয়া তাহার মরহুমপিতা বৃহত্তর সিরিয়া গঠনের যে কল্পনা করেন, তাহা বাস্তবে পরিণত করার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ। ১১৫৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার সৈন্যেরা দামেশ্‌ক-এর সম্মুখে উপনীত হইল। শের্কুহ্‌ তাহাদের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সেকালের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আত্মরক্ষার খাতিরে আইয়ুব ছয় দিন পরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতিদানে তিনি দামেশ্‌ক নগরীর ও শের্কুহ্‌ সমগ্র দামেশ্‌ক প্রদেশ সহ এমেসা নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

১১৫৪ হইতে ১১৬৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সালহ্‌উদ্দীন দামেশ্‌ক-এ সুলতান নুরুদ্দীনের দরবারে অবস্থান করেন। পূর্ববর্তী পনর বৎসরের ন্যায় এই দশ বৎসরের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁহার জীবন-চরিত লেখকেরা একেবারে নীরব।

শিকারই ছিল সেকালের আমীরদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায়। এজন্য কনস্টান্টিনোপল হইতে নিয়মিতভাবে শিকারী কুকুর ও বাজপাখী আনাইয়া দামেশ্‌ক-এ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্দ্ধিত, প্রতিপালিত ও শিক্ষিত করা হইত। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন যে দেশ-প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একজন সুকৌশলী শিকারীতে পরিণত হন, এইরূপ অনুমানের কোনই কারণ নাই। খৃস্টানদের নিকট হইতে নুরুদ্দীন অন্ততঃ পঞ্চাশটি দুর্গ কাড়িয়া লন। এই সকল যুদ্ধে শের্কুহ্‌ অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন ইহার কোনটিতেই যোগদান করেন বলিয়া জানা যায় না। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি কিরূপে এত অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

কবিতা-প্রিয় হইলেও সূক্ষ্ম তর্ক-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার যত আসক্তি ছিল, কাব্যের প্রতি তত ছিল না। কাজেই তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা কবিরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, তাহারও সম্ভাবনা কম। সে যুগের 'জ্ঞানীগণের নেতা' ইব্‌নে আবী উস্‌রাণ যখন দামেশ্‌ক-এর মস্‌জিদে বক্তৃতা করিতেন, তখন সালাহ্‌উদ্দিন সম্ভবতঃ

দূরদেশ হইতে আগত সুধীমণ্ডলীর নিকট হইতে দূরে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। নতুবা ওসামার আত্ম-চরিতের কোথাও না কোথাও তাঁহার নাম উল্লিখিত হইত। বস্তুতঃ সংসারে যাঁহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বড় হইয়া গিয়াছেন, সালাহ্‌উদ্দিন তাঁহাদেরই একজন। প্রাথমিক জীবনে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনই আভাস পাওয়া যায় না। অবশ্য ক্ষমতালাভের পর উহার সদ্ব্যবহার করিতে কখনও তাঁহার শৈথিল্য দেখা যায় নাই। কিন্তু চাচা ও বন্ধুবর্গের নির্বন্ধাতিশয্য ব্যতীত তিনি আদৌ রাজনীতি-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতেন কিনা, সন্দেহ। হয়ত এই শান্ত-স্বভাব ধার্মিক যুবক কাল-স্রোতের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বার্ধক্যে উপনীত হইয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত ভাবে ভব-লীলা সাঙ্গ করিতেন, হয়ত তিনি ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠ রক্ষক সালাহ্‌উদ্দীন বা ইউরোপীয়দের অতি-আদরের সালাদিন না হইয়া শুধু দামেশ্‌ক-এর বোর ইউসুফ'ই থাকিয়া যাইতেন। বিধির বিধি সত্যই দুর্বোধ্য।

মিসর জয়

উমাইয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাদের আমলে নবী-বংশের উপর যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে একদল মুসলমানের সহানুভূতি স্বভাবতঃই এই উপদ্রুত বংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহারা শিয়া (দল) নামে পরিচিত। বাকী মুসলমানেরা প্রধানতঃ সুন্নী। শিয়াদের সাহায্যে ফাতিমিয়ারা আব্বাসিয়াদের হাত হইতে উত্তর আফ্রিকা (৯০৯ খৃঃ) সিরিয়া, আরব ও মিসর (৯৬৯) কাড়িয়া নিয়া সেখানে স্বতন্ত্র খেলাফত কায়েম করেন। প্রায় তিন শতাব্দী (৯০৯-১১৭১) পর্যন্ত তাঁহারাই ছিলেন ভূমধ্য সাগরীয় উপকূলের প্রবলতম রাজশক্তি। সিসিলী তাঁহাদের অধিকারে আসে। তাঁহাদের অর্ণবযান লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রাচ্যের বিপুল বাণিজ্যের শুল্ক মিসরেই আদায় হইত। কাজেই মিসরীয়দের ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না।

প্রথমে নিরাড়ম্বর জীবন যাপন করিলেও ক্রমে মিসরের ধনৈশ্বর্য্যে খলীফাদের চরিত্র বিনষ্ট হইতে লাগিল। কর্মচারীদের হস্তে রাজ্যের গুরু-ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। উজীরেরা রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাজ উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করিলেন। উজিরীর জন্য রাজ্যমধ্যে নিরন্তর গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১১৬৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে উত্তর মিসরের আরব শাসনকর্তা শাবের উজির আজমের পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সাত মাস পরে বাকিয়া সেনাদলের অধিনায়ক দীর্গাম তাঁহাকে মিসর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। শাবের দামেশ্‌ক-এ পলাইয়া গিয়া নূরুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নূরুদ্দীন যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে ও মিসরের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় প্রত্যয় না হওয়ায় এবং মরুভূমি অতিক্রমকালে ফ্রাঙ্ক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সুলতান ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

অবস্থার চাপে নূরুদ্দীনের এই দ্বিধা বেশী দিন টিকিল না। যুদ্ধে সাহায্য দানের শর্তে জেরুজালেম-রাজ মিসরের রাজস্ব হইতে বার্ষিক

কিছু টাকা পাইতেন। ইহা লইয়া দীর্গমের সহিত প্রথম আমালরিকের বিবাদ বাধিল। বিষয়টি পরিশেষে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত গড়াইল। বিলবায়সের নিকটে পরাজিত হইয়া উজির নীল নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সমগ্র দেশ পানিতে ডুবিয়া যাওয়ায় আমালরিককে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হইল। এমন সময় শাবেরের দামেশক গমন বার্তা দীর্গামের কানে আসিল। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি অঙ্গীকৃত অর্থের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দিতে স্বীকার করিয়া জেরুজালেমে দূত পাঠাইলেন।

মিসরের রাজস্বে আমালরিকের শক্তিবৃদ্ধি হউক, নূরুদ্দীন কিছুতেই ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খৃস্টানেরা তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তিনি এপ্রিল মাসে ১১৬৪ শের্কুহ্‌কে একদল শক্তিশালী সৈন্য সহ মিসর প্রেরণ করিলেন। পিতৃব্যের ঐকান্তিক অনুরোধে সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

বিল্‌বায়সে মিসরীরা পরাজিত হইল। শাবের ফুস্তাত ও অন্যান্য সেনাপতি কায়রো অবরোধ করিয়া রহিলেন। রাজকোষে অর্থাভাব ঘটায় দুর্বুদ্ধিবশতঃ দীর্গাম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অর্থে হস্তক্ষেপ করিলেন। অমনি লোকে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সাহায্য লাভের আশায় নগরের দূরবর্তী অংশের দিকে গমনকালে তাঁহার অশ্ব কোলাহলে ক্ষেপিয়া গিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধোন্মত্ত জনতা তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল। এইরূপে মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ শূর, ধানুকী ও অশ্বারোহী এবং ইব্‌নে-মুক্‌লার ন্যায় লেখক ও কবির অকালে মৃত্যু ঘটিল।

মে মাসে শাবের স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু উজিরী পাইয়াই তিনি শের্কুহ্‌কে কৌশলে কায়রো হইতে বাহির করিয়া দিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দানে অস্বীকৃত হইয়া বসিলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। শাবেরের আমন্ত্রণে আমালরিক মিসরে আসিলেন। শের্কুহ্‌ চতুর্দিকে পরিখা খনন করিয়া তিন মাস পর্যন্ত বিলবায়সে আত্মরক্ষা করিলেন। এদিকে নূরুদ্দীনের সৈন্যরা হারিম অধিকার করিয়া বেনিয়াস অবরোধ করায় আমালরিকে স্বরাজ্য রক্ষায় ছুটিতে হইল। সন্ধি-সূত্রে 'মিসর মিসরীদের জন্য' রাখিয়া শের্কুহ্‌ও দেশে ফিরিয়া গেলেন।

বিনা গৌরবে প্রথম মিসরাভিযান সমাপ্ত হইলেও উহা একেবারে নিরর্থক হইল না। মিসরের সামরিক দৌর্বল্য অবগত হইয়া শের্কুহ্ পুনরায় সেখানে সৈন্য পাঠাইবার জন্য সুলতানকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বাগদাদের আব্বাসিয়া খলীফা তাঁহাকে দোয়া পাঠাইলেন। তথাপি সতর্ক নূরুদ্দীন কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে শাবের পুনরায় ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সন্ধি করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন।

১১৬৭ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে শের্কুহ্ দুই হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া পুনরায় মিসরে হাজির হইলেন। গির্জায় তাঁহার শিবির পড়িল। আমালরিকও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নদীর অপর তীরে ফুস্তাতের নিকটে তাঁবু ফেলিলেন। শাবের তাঁহাকে নগদ দুই লক্ষ ও যুদ্ধশেষে আরও দুই লক্ষ মোহর দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। উজিরের কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় আমালরিক স্বয়ং খলীফার দ্বারা সন্ধি-পত্র অনুমোদন করাইয়া লইলেন। তাঁহার সৈন্যরা এক রাত্রিতে নৌকাযোগে নীল নদী পার হইল। বাধা দানের সুবিধা না পাইয়া শের্কুহ্ উত্তর মিসরের দিকে প্রস্থান করিলেন। আমালরিক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন। বন্ধুবর্গের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করিয়া শের্কুহ্ আল্‌বাবানে তাঁহার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সালাহ্‌উদ্দীন চালাকি করিয়া প্রথমেই পশ্চাতে পিছাইয়া গেলেন। তিনি পলায়ন করিতেছেন ভাবিয়া মিত্র-বাহিনীর অগ্রভাগ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিল। এদিকে শের্কুহ্ শত্রুপক্ষের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিয়া মিসরীদিগকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বহু সৈন্য নিহত হইল। আর যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। ওদিকে সালাহ্‌-উদ্দীন কিছুদূর গিয়া হঠাৎ পিছন দিকে ফিরিয়া খৃস্টানদের উপর আপতিত হইলেন। সহসা আক্রান্ত হইয়া তাহারা পশ্চাতে হটিয়া গেল। কিন্তু পূর্বস্থানে আসিয়া মিত্রদের সাড়া না পাইয়া তাহারাও তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিল। শের্কুহ্ ও সালাহ্‌উদ্দীন পলাতকদের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। বহু লোক বন্দী ও শত্রুপক্ষের সমস্ত রসদ-পত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল। শের্কুহ্ বিনা বাধায় আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করিলেন। সালাহ্‌উদ্দীনকে ইহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য পুনরায় উত্তর মিসরে চলিয়া গেলেন।

অল্প দিন পরে ফ্র্যাঙ্ক ও মিসর বাহিনী স্থলপথে এবং খৃস্টান নৌ-বহর জলপথে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিল। সালাহ্উদ্দীনের সঙ্গে তখন মাত্র এক হাজার সৈন্য ছিল। খৃস্টানদের আনীত প্রাচীর-ধ্বংসকারী মারাত্মক যন্ত্রাবলী দেখিয়া নাগরিকেরা হতাশ হইয়া পড়িল। তদুপরি নিয়ত অবরুদ্ধ থাকায় নগরে খাদ্যাভাব দেখা দিল। এমতাবস্থায় আড়াই মাস পর্যন্ত আত্মরক্ষা করা সহজ কথা নহে। বস্তুতঃ সটান নির্জনবাস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সালাহ্উদ্দীন বাবানের যুদ্ধে ও আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধে যে অপূর্ব ধৈর্য্য, সাহস, রণ-কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তাহাতে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদেরই বলে জাত সৈনিক।

আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সংবাদ পাইয়া শের্কুহ্ শত্রুদের মনো-যোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য কায়রো আক্রমণ করিলেন। বাধ্য হইয়া আমালরিককে সন্ধির প্রস্তাব উঠাইতে হইল। শের্কুহ্ প্রথমে নারাজ হইলেন। কিন্তু অর্ধ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ায় অবশেষে তাঁহার সুর নামিয়া আসিল। ১১৬৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট পূর্ব্ব-শর্তে উভয় পক্ষে আবার সন্ধি হইল। তদনুসারে শের্কুহ্ পুনরায় দামেশ্কে গমন করিলেন। কিন্তু আমালরিক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মিসরে তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখার সমস্ত ব্যবস্থা মজবুত করিয়া গেলেন। কারণ, কায়রোতে খৃস্টান প্রহরী ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত শাবের জেরুজালেম-রাজাকে বার্ষিক এক লক্ষ দিনার কর দানের অঙ্গীকার করিতেও বাধ্য হইলেন।*

আমালরিকের উগ্র-স্বভাব পরামর্শদাতারা ইহাতেও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া মিসর জয়ের জন্য তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। রাজা ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিলেন, "আমরা মিসর আক্রমণ করিলেই শাবেরকে বাধ্য হইয়া নূরুদ্দীনের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।' তখন মিসর জয় দূরের কথা, জেরুজালেম রক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িবে।" কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিশ্বাসঘাত-কদের প্রস্তাবে সায় দিতে হইল। প্রকাশ্যভাবে সন্ধিভঙ্গ করিয়া এবং বিন্দুমাত্রও কারণ না দর্শাইয়া খৃস্টান বাহিনী আবার মিসর যাত্রা

*Archer & Kingsford Crusades, 235.

করিল। ১১৬৮ খৃস্টাব্দের ৎরা নভেম্বর বিলবায়সে (পেলুসিয়াম) উপস্থিত হইয়া তাহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক ও রক্ষী সৈন্যকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল।

একে বিশ্বাসঘাতকতা, তদুপরি না-হক্ নরহত্যা ; 'গোদের উপর বিষফোড়া'। সমগ্র মিসর ক্ষেপিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ নূরুদ্দীনের পক্ষাবলম্বনে প্রস্তুত হইল। খৃস্টানেরা ফুস্তাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কায়রো রক্ষা করা কঠিন হইবে ভাবিয়া শাবের তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন (নভেম্বর, ১৪)। তিন শত বৎসর পর্যন্ত ফুস্তাত মিসরের রাজধানী ছিল। ইহা দগ্ধ হইতে ৫৪ দিন লাগিল। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কত সমৃদ্ধ নগরই না এভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে! কায়রোর দক্ষিণের জনহীন সুবিস্তৃত বালুকা স্তূপের মধ্যে আজও ফুস্তাতের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাবের ছিলেন পাকা কূটরাজনীতিবিদ। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক বলক্ষয় করার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি এক দিকে লোভী খৃস্টানদিগকে অর্থদান করিয়া কায়রো আক্রমণে বিরত রাখিলেন। অন্য দিকে সাহায্য চাহিয়া দামেশ্‌কে দূত পাঠাইলেন। আর খলীফা নূরুদ্দীনের নিকট পত্র লিখিলেন।

৮০০০ উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া ১৭ই ডিসেম্বর শের্কুহ্ আবার মিসরে চলিলেন। সালাহ্‌উদ্দীনকে সঙ্গে যাইতে বলায় তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, মিসরের রাজত্ব দিলেও আমি সেখানে যাইব না। আলেকজান্দ্রিয়ায় যে কষ্ট পাইয়াছি, কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না।" কিন্তু শের্কুর নির্বন্ধাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মত পরিবর্তন করিতে হইল। মৃত্যুমুখে বিতাড়িত ব্যক্তির ন্যায় তিনি মিসরে চলিলেন। এই অনিচ্ছাকৃত যাত্রাই অচিরে তাঁহাকে ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিল। 'হয়ত তুমি যাহা ঘৃণা কর, তাহাই তোমার পক্ষে ভাল, সালাহ্‌উদ্দীনের জীবনী কোরআনের এই মহাবাণীর পূর্ণ বিকাশ।

শের্কুর অগ্রগতি রোধের জন্য আমালরিক মরুভূমির দিকে ছুটিলেন। কিন্তু শের্কুহ কৌশলে তাঁহার সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া ৯ই জানুয়ারী (১১৬৯) মিসর বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। শাবের কর্তৃক প্রতারিত ও শের্কুর সামরিক বুদ্ধির নিকট পরাভূত হইয়া আমালরিক আর যুদ্ধ না করিয়াই স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। সম্পূর্ণ

বিনা রক্তপাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় তুর্কেরা বিজয়-বাদ্য বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিল। কৃতজ্ঞ খলীফা শের্কুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটি খেলাত উপহার দিলেন। ধূর্ত শাবের তাঁহাকে বাহ্য ভক্তিতে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। অথচ সিরীয় সর্দারগণকে বন্দী করার জন্য গোপনে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ সালাহ্উদ্দীন ও কয়েকজন আমীর ইহা টের পাইয়া একদিন অসতর্ক অবস্থায় শাবেরকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। খলীফার আদেশে অবিলম্বে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইল। কুটিল-প্রকৃতি হইলেও শাবের ছিলেন একজন পাকা রাজনৈতিক ও কবিতার বড় সমজদার। একবার একটি গীতি-কবিতা শুনিয়া তিনি এতই আনন্দিত হন যে, প্রসিদ্ধ কবি ওমারার মুখ-গহবর স্বর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন।

১৮ই জানুয়ারী খলিফা আল্-আজিজ শের্কুহ্কে আল্-মালিক আন্নাসির (বিজয়ী রাজা) উপাধি দিয়া শাবেরের শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার উজীরী প্রাপ্তিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু বেশী দিন এই মর্যদা ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। অতি-ভোজনের ফলে দুই মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল (২৩শে মার্চ)। শের্কুর অকাল মৃত্যুতে সালাহউদ্দীনের ভাগ্য-পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল।

উজীর সালাহ্‌উদ্দীন

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি অতি সামান্য। সে যেখানে কল্পনায় বিপদের বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, আল্লাহ্ হয়ত সেখানেই তাহার জন্য অসীম কল্যাণ নিহিত রাখেন। কুরআন সত্যই বলিয়াছে, "আল্লাহ্ জ্ঞানী আর মানুষ অজ্ঞ।" মিসর গমনের পূর্বে সালাহ্-উদ্দীন তাঁহার ভাগ্য-পটে দুঃখ-কষ্টের কাল রেখা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কিন্তু এখন উহাই তাঁহাকে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিল। সমস্ত প্রবীণ লোককে উপেক্ষা করিয়া খলিফা সালাহ্‌উদ্দীনকেই 'আল্-মালিক আন্-নাসির' উপাধি দিয়া ২৬শে মার্চ উজীরের শূন্য গদীতে বসাইলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক-জন তুর্কী সেনাপতি সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া এবং বিখ্যাত আইনজ্ঞ আল্-হক্কানীর সাহায্যে অনেক বুঝাইয়া সালাহ্‌উদ্দীন অতি কষ্টে অবশিষ্ট সৈন্য ও সেনাপতিকে নিজের নিকটে রাখিতে সমর্থ হইলেন।

সৈন্যদলের বিরুদ্ধভাব থামিয়া গেলে সালাহ্‌উদ্দীন পূর্বাপেক্ষা অধিক সংযম ও কঠোরতার সহিত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বজাতির দুঃখ দুর্দশা বিমোচনের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া এখন হইতে তাঁহার সমগ্র শক্তি ও উদ্যম এক মহান উদ্দেশ্যে—খৃস্টান-দিগকে এশিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে পারে এরূপ একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠনে নিয়োজিত হইল। তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন, "আল্লাহ্ যখন মিসরের শাসন-ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, তখন প্যালেস্টাইনও তিনি আমারই জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।" তাঁহার পদ খুবই জটিল ছিল। এক দিকে তিনি শিয়া খলিফার উজীর। অন্যদিকে সুন্নী সুলতানের প্রতিনিধি। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সালাহউদ্দীন নির্বোধ ছিলেন না। তিনি খুৎবায় উভয়েরই মঙ্গল কামনার আদেশ দিয়া ব্যাপারটা সোজা করিয়া ফেলিলেন। হঠাৎ কোন গুরুতর পরিবর্তন করিতে গেলে উহার ফল তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইতে পারিত। মিসরীয় সভাসদ্

ও কর্মচারীরা তাঁহাকে ঈর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখিতেন। প্রাসাদের সৈন্য ও ভৃত্যেরা প্রকাশ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিত। নূরুদ্দীন তাঁহার উজীরী প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেও তাহাতেও আন্তরিকতা ছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই সালাহ্উদ্দীনের কাজ হইল, কাহারও অধিক ঈর্ষা বা সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন মিসরের ফেরাউনের মন্ত্রী হজরত ইউসুফের ন্যায় স্বীয় পরিজনবর্গকে মিসরে আনয়ন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা নির্বাসিত আমীরদের জায়গীর পাইলেন আর আইয়ুব স্বেচ্ছায় কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। প্রতিদানে সকলেই বিশ্বস্ততার সহিত প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ভ্রাতৃগণের সহায়তা শীঘ্রই তাঁহার খুব কাজে লাগিল। খলিফা মনে করিয়াছিলেন, সালাহ্উদ্দীনের ন্যায় শান্ত-শিষ্ট যুবককে তিনি নিজের ইচ্ছামত চালাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার তস্বিহের ভিতর যে এত ক্ষমতা লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত? যেই মাত্র খলিফা তাঁহার নির্বাচনের ভুল বুঝিতে পারিলেন, অমনি নূতন উজীরকে ধ্বংস করার জন্য গুপ্ত-মন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া গেল। খোজাধ্যক্ষ নেজার নেতৃত্বে ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সন্ধির কথাবার্তা চলিল। দৈবক্রমে সালাহ্উদ্দীন ইহা টের পাইয়া তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। ফলে হতভাগ্য ধৃত হইয়া ফাঁসী-কাষ্ঠে আত্মাহুতি দিল (জুলাই, ১১৬৯)। প্রধানতঃ সূদানীদের দ্বারাই তখন মিসর-বাহিনী গঠিত হইত। তাহাদের নেতা ও স্বদেশবাসীর প্রাণদণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চাশ হাজার কাফ্রী সালাহ্উদ্দীনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। খলিফার পূর্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্তী বায়নুল কাস্রায়নে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। বহুলোক হতাহত হওয়ার পর কাফ্রীরা পরাজিত ও তাহাদের বাসভূমি আল্-মনসুরিয়া ভস্মীভূত হইল। নিরুপায় হইয়া তাহারা দয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহাদিগকে প্রথমে গির্জায় ও পরে উত্তর মিসরে স্থানান্তরিত করা হইল।

দূরে গিয়াও খলিফা-পক্ষীয় লোকদের উত্তেজনায় কাফ্রীরা ছয় বৎসর পর্যন্ত সালাহ্উদ্দিনকে বিরক্ত করিয়া মারিল। ১১৭১-২ খৃস্টাব্দের শীত ঋতুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুরাণ শাহ্ তাহাদিগকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। কিন্তু পর বৎসর তাহারা আবার বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলন করিল। পরবর্তী শীত ঋতুতে তিনি

তাহাদিগকে নিউবিয়া পর্যন্ত তাড়াইয়া নিয়া ইব্রিম বা পিরিস্ নগর দখলে আনিলেন। কেন্‌জুদ্দৌলার নেতৃত্বে তথাপি তাহারা পর বৎসর (১১৭৪) আস্‌ওয়ানে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। সালাহ্‌উদ্দীনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সায়ফুদ্দীন আল্-আদিল ঘোর যুদ্ধের পর সেপ্টম্বর মাসে কেন্‌জুকে নিহত করিলেন। ইহার পরেও ১১৭৬ খৃস্টাব্দে দুর্দ্দান্ত কাফ্রীরা কপ্‌টসে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আল্-আদিল এবার তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, চিরতরে তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

বিদ্রোহী কাফ্রীদিগকে কায়রো হইতে বিতাড়িত করিতে না করিতেই এক বিষণতর বিপদ উপস্থিত হইল। নূরদ্দীনের সেনাপতি কর্তৃক মিসর অধিকৃত হওয়ায় দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে পড়িয়া পালেস্টাইনের খৃস্টান শক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিল। কাজেই কায়রোর ষড়যন্ত্রকারীদের আমন্ত্রণ পাইয়া আমালরিক অবিলম্বে তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। গ্রীক সম্রাট ম্যানুয়েল জামাতার সাহায্যে আসিলেন। দুইশত রণ-তরী সমুদ্রপথে ও এক শক্তিশালী ক্রুসেডার বাহিনী স্থলপথে দামিয়েতা অবরোধে ছুটিয়া চলিল। অনুকূল বায়ুর অভাবে নৌবহরের আসিতে বিলম্ব ঘটায় সালাহ্‌উদ্দীন রক্ষী সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের জন্য সিরিয়ায় দূত প্রেরণ করিলেন। প্রতিউত্তরে দামেশ্‌ক হইতে দলে দলে সৈন্য আসিতে লাগিল। খৃস্টানদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য নূরউদ্দিন স্বয়ং প্যালেস্টাইন আক্রমণ করিলেন।

১১৬৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে দমিয়েতা অবরোধ আরম্ভ হইল। নৌ-বহর আসিতে আরও তিন দিন বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এক অজেয় দুর্গ পোতাশ্রয় রক্ষা করিতে উহার প্রবেশ পথে ছিল এক গাছি দৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খল। তাহাতে প্রতিহত হইয়া নৌ-বহর প্রোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। রক্ষী সৈন্যেরা অকস্মাৎ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া কয়েকটি অবরোধ-যন্ত্রে আগুন লাগাইয়া দিল। এমন কি তাহারা নৌবহরের একাংশ পর্যন্ত পোড়াইয়া ফেলিল। কিছুদিন পরেই খৃস্টান শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ফল ভক্ষণের দরুণ তাহাদের অনভ্যস্ত পাকস্থলীতে গোলমাল আরম্ভ হইল। রোগ ও অনাহারে ক্রুসেডারদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহাদের পরাজয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রকৃতিও অবরুদ্ধ নাগরিকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হইল। মুষলধারে বারিপাতের ফলে খৃস্টানদের শিবিরগুলি পানিতে ভর্তি হইয়া গেল। ভীষণ ঝড়ে শিবির-দণ্ড ও অবরোধ-মঞ্চসমূহ উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। রক্ষী সৈন্যেরা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের দুর্দশা শতগুণে বাড়াইয়া তুলিল। পঞ্চাশ দিন ব্যর্থ অবরোধের পর আমালরিক তাঁহার অর্ধ-উপবাসী সৈন্যগণকে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। 'বিপদ কখনও একা আসে না।' পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া খৃস্টান নৌ-বহর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। উটপাখীর ন্যায় শৃঙ্গের সন্ধানে গিয়া তাহারা পাল দু'খানা রাখিয়া ফিরিয়া আসিল।

এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর খৃস্টানেরা আর পর-রাজ্য আক্রমণে সাহসী হইল না। এখন হইতে তাহাদিগকে সালাহ্উদ্দীনের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে হইল। পূর্বের কৃতকার্যতায় উৎসাহিত হইয়া তিনি শীঘ্রই চির-শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। এই সংগ্রাম দীর্ঘ বাইশ বৎসরের মধ্যে আর থামে নাই। প্রথমে সীমান্তের গাজার উপর তাঁহার নজর পড়িল। পথিমধ্যে তিনি দারুম নামক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিলেন। টেম্পলার নাইটদের হাতে ইহার রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা আমালরিকের আগমন পর্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিলেন। রীতিমত যুদ্ধ করা সালাহ্উদ্দীনের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া তিনি অবরোধ উঠাইয়া গাজার দিকে ছুটিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই নগর তাঁহার দখলে আসিল। নগর হইতে তিনি বিপুল পরিমাণ মালে গাণীমাত লাভ করিলেন।* কিন্তু দুর্গ অবিজিত রহিল। দুর্গাধ্যক্ষ পলাতক নাগরিগণকে আশ্রয় দানে অসম্মত হওয়ায় তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিল। দীর্ঘকাল অবরোধ চালাইবার ইচ্ছা না থাকায় বিপুল পরিমাণ মালে

* মালে গাণীমাত বলা হয় শত্রু পক্ষের নিকট হইতে লব্ধ অর্থ সম্পদকে। তাহারা যে সব সম্পদ ফেলিয়া রাখিয়া পালাইয়া যায় অথবা তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে যে সম্পদ ছিনাইয়া লওয়া হয় তাহাই মালে গাণীমাত। ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইহার এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মাল বা রাজ কোষাগারে জমা দিতে হয় এবং অবশিষ্ট চার ভাগ সংশ্লিষ্ট সেনানীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্য বসতঃ পাশ্চাত্য লেখকদের দেখাদেখি এখানকার অমুসলিম ও সেই সাথে অনেক মুসলিম লেখক এই মালে গাণীমাতকে লুণ্ঠিত দ্রব্যে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। অথচ লোভের বশবর্তী হইয়া যে সম্পদ অপহরণ করা হয় তাহাকেই লুণ্ঠিত দ্রব্য বলে। কিন্তু সুলতান সালাহ্উদ্দীনের বেলায় তাহা প্রযোজ্য হইবে না।

গাণীমাত সহ মিসরে ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘকাল পরে তাহাদের উজীরকে বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া মিসরীয়দের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

কিছু দিন পরে সালাহ্‌উদ্দীন আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত আয়লা দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। লোহিত সাগরের পথে যাঁহারা মক্কা যাইতেন, ইহা ছিল তাঁহাদের পক্ষে চাবি স্বরূপ। কায়রোতে জাহাজের যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া এগুলি উটের পিঠে চাপাইয়া লোহিত সাগর-তীরে আনা হইল। সেখানে জাহাজ নির্মাণ করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন জল, স্থল উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ চালাইয়া ১১৭০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে আয়লা দুর্গ হস্তগত করিলেন।

এরূপ কৃতকার্যতা লাভের ফলে মিসরীয় মহলে নূতন উজীরের খ্যাতি বাড়িয়া গেল। খৃস্টানেরা ছিল সমস্ত মুসলমানেরই শত্রু। কাজেই শান্তির সময় সালাহ্‌উদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইলেও যুদ্ধ-কালে তাহারা শিয়া-সুন্নীর পার্থক্য ভুলিয়া দলে দলে তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইত। ক্রমে তাহারা তাঁহাকে দেশ ও ধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ রক্ষক বলিয়া মানিয়া লইল। নেজার প্রাণ-দণ্ডের পর হইতেই খোজা-প্রহরী কারাকুশ খলীফার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নির্জ্জন-বাস ও ক্ষমতাহীনতায় কায়রোতে শিয়া মতের প্রাধান্য হ্রাস প্রাপ্ত হইল। ফুস্তাতে নাসিরিয়া ও কামহিয়া নামে দুইটি মাদ্রাসা স্থাপন এবং প্রধান প্রধান প্রাদেশিক নগরে আলেম নিযুক্ত করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন দেশের অভ্যন্তরেও সুন্নী মত বিস্তারের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে উদ্যোগ-পর্ব সমাপ্ত করিয়া তিনি শুধু সুযোগের প্রতিক্ষায় রহিলেন। অবশেষে অসহায় খলিফা অসুস্থ হইয়া পড়িলে ১১৭১ খৃস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর সালাহ্‌উদ্দীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশে বড় মস্‌জিদের ইমাম ফাতিমিয়া খলিফার পরিবর্তে আব্বাসিয়া খলিফার নামে খোৎবা পাঠ করিলেন। মুসল্লীরা (উপাসকেরা) ইহাতে বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীনের ক্ষমতা তখন এতই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত যে, কাহারও মুখ হইতে প্রতিবাদের একটি ক্ষীণ শব্দও উচ্চারিত হইল না।

যে ধর্ম-বিপ্লবের ফলে মুস্‌লিম জগত দ্বিধা-বিভক্ত হয়, এইরূপে দুই শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ বিনা বাধায় তাহার অবসান ঘটাইয়া

সালাহ্‌উদ্দীন অসীম গৌরবের অধিকারী হইলেন।* খলিফা আল্-মুস্তাদী আহ্‌লাদে আটখানা হইয়া রাজধানী আলোক-মালায় সজ্জিত করিলেন। নূরুদ্দীন দুইখানা তরবারি ও সুলতান উপাধি পাইলেন। প্রভুর নিকট হইতে সালাহ্‌উদ্দীনের জন্য শাহী খেলাত ও আব্বাসিয়াদের কৃষ্ণ-পতাকা আসিল। করুণা করিয়া তিনি রুগ্ন ফাতিমিয়া খলিফাকে এই সংবাদ জানাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিন দিন পরে (১৩ই সেপ্টেম্বর) খলিফা আল্-আজীজ একুশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই শান্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কারাকুশ তাঁহার পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের উপর কড়া নজর রাখিলেন। ফলে তাঁহারা সালাহ্‌উদ্দীনের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

* "...Saladin had the glory of ending a schism which had lasted two hundred years..."—Cox, Bart, 99.

সালাহ্‌উদ্দীনের কায়রো

বর্তমান সময় যাঁহারা কায়রো দর্শনে গমন করেন, সালাহ্‌-উদ্দীনের রাজধানীর অতি সামান্য অংশই তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। তিনটি পুরাতন দ্বার, তিনটি ভগ্ন-প্রায় মস্‌জিদ ও প্রাচীন প্রাচীরের অংশবিশেষ ব্যতীত এখন উহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। বর্তমান কায়রোর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক দৃশ্য—বহু-সংখ্যক অত্যুচ্চ চমৎকার বুরুজ-শোভিত, দৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নগররক্ষী দুর্গের তখন অস্তিত্ব ছিল না। তৎপরিবর্তে সেখানে মুকাত্তাম শৈলের একটি চক্রাকার বাহু শোভা পাইত। নীল নদী তখন আরও অনেক পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। ইউরোপীয়দের বাসভূমি ইস্‌মাঈলিয়া পাড়ার অধিকাংশই নদী-গর্ভে নিহিত ছিল। বুলক দ্বীপ তখনও পানির উপরে জাগিয়া উঠে নাই। উত্তরেও কোন অব্বাসিয়া উপনগরী নির্মিত হয় নাই। বর্তমান কালের ন্যায় গৃহ ও রাজপথগুলি তখনও প্রাচীন জুবিলা দ্বার ছাড়াইয়া দক্ষিণে সেন্ট্‌ নেফিসার উপাসনাগার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরও দক্ষিণে ছিল অনেকগুলি ক্ষুদ্র পাহাড়। প্রাচীন ফুস্তাত এবং তদপেক্ষাও প্রাচীনতর বেবিলন নগরীর ধ্বংসাবশেষ এই শৈল-শ্রেণীর উপাদান। উপরাংশ বালুকায় ঢাকা পড়িয়া যাওয়ায় উহাদের এককালীন সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নগুলি মানব-দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।

মুসলমান আমলে মিসরের রাজধানী কয়েকবার দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয়। ৬৪১ খৃস্টাব্দে মিসর-বিজেতা আমর ফুস্তাত বা পট-মণ্ডপ নির্মাণ করেন। যেখানে আব্বাসিয়া সেনাপতি তাঁহার শিবির স্থাপন করেন, সেখানে ৭৫০ খৃস্টাব্দে আল্‌-আস্‌কার (তাঁবু) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার আরও উত্তর-পূর্ব দিকে ৮৬৯ খৃস্টাব্দে আহ্‌মদ ইব্‌নে-তুলুন আল্‌-কাতাইর (পাড়া-শ্রেণী) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মিসরে মুসলমানদের সর্বশেষ রাজধানী কায়রো ৯৬৯ খৃস্টাব্দে কায়রোওয়ানের ফাতিমিয়া খলিফার সেনাপতি জহর মিসর জয় সম্পূর্ণ করিয়া প্রভুর জন্য ইহা নির্মাণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম আল্‌-কাহেরা বা বিজয়ী।

ইটালীয়রা ইহাকে বিকৃত করিয়া কায়রো বলিত। বর্তমানে সকলেই তাহাদের অনুকরণ করিতেছে। ইহা মদীনা বা নগর নামেও অভিহিত হইত। ফাতিমিয়াদের কায়রো ছিল এক সুরক্ষিত বিশাল দুর্গ। পূর্ব ও পশ্চিম প্রাসাদের মধ্যবর্তী বিরাট প্রাঙ্গণকে বলা হইত বায়নুল কাস্‌রায়ন (প্রাসাদদ্বয়ের মধ্যস্থল)।

ভূগর্ভস্থ পথ দিয়া খলিফারা প্রাসাদান্তরে গমন করিতেন। পূর্ব বা বৃহত্তর প্রাসাদটিতে চারি হাজার কক্ষ ছিল। এত আড়ম্বরের মধ্যে বাস করা সালাহ্‌উদ্দীনের পছন্দ না হওয়ায় শুধু যত্নের অভাবে এমন চমৎকার সৌধ দুইটি নষ্ট হইয়া যায়। আল্‌-আজহার মস্‌জিদ ভিন্ন আল্‌-কাহেরার এবং ইব্‌নে-তুলুনের ধ্বংস-প্রায় চমৎকার কারুকার্য খচিত মহাড়ম্বর মস্‌জিদ ব্যতীত আল্‌-কাতাইর পূর্ব সমৃদ্ধির আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। কেবল প্রাচীন বেবিলন দুর্গ ও আমর মস্‌জিদ ফুস্তাতের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দানের জন্য কোনরূপে টিকিয়া আছে। কালের কুটিল নিষ্পেষণে আল্‌-আস্‌কার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচ্যের রাজন্যবৃন্দ অট্টালিকাদি নির্মাণে গর্বানুভব করিতেন। সালাহ্‌উদ্দীনও এই চিরন্তন নীতির অনুসরণ করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী রাজাগণের ন্যায় রাজধানীকে আরও উত্তর-পূর্ব দিকে সরাইয়া নেওয়া তাহার মনঃপূত হইলনা; তিনি এক বৃহৎ প্রাচীরের সাহায্যে প্রাচীন রাজধানী-চতুষ্টয়ের সংযোগ সাধন করিতে চাহিলেন এবং নূতন প্রাসাদ নির্মাণ না করিয়া মুকাত্তাম শৈল-শ্রেণীর পশ্চিম বাহুর উপরে একটি নগর-রক্ষী দুর্গ নির্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। প্রলয়ঙ্কর তৃতীয় ক্রুসেডের চাপে তিনি এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার অবসর পান নাই। তাঁহার আমলে দুর্গের একাংশ মাত্র নির্মিত হয়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্রুতনামা খুল্লতাতের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করেন। বাবুল-মোদারাস বা সোপান-দ্বারের শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ৫৯৮ হিজরীতে (১১৮৩-৪খৃঃ) আল্‌-আদিলের তত্ত্বাবধানে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে-কারাকুশ কর্তৃক কায়রো দুর্গ নির্মিত হয়। ২৮০ ফুট গভীর বীরে ইউসুফ বা ইউসুফের কূপও এই আবদুল্লার খনিত। সালাহ্‌উদ্দীনের পুণ্য-স্মৃতি বহন করিয়া ইহা আজও বর্তমান আছে। দুর্গের অপর যে সকল অট্টালিকাদি তাঁহার নামে পরিচিত, সেগুলি

পরবর্তীকালের কীর্তি। প্রস্তাবিত প্রাচীরও সালাহ্‌উদ্দীনের জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি যেটুকু নির্মাণ করেন, তাহার ফলে নগর রক্ষী দুর্গের সহিত শুধু আল্-কাহেরার সংযোগ সাধিত হয়। কিন্তু ইহার দরুণ সেন্ট্ নেফিসার ভজনালয় হইতে ফাতিমিয়া 'নগর'পর্যন্ত সমস্ত শহরতলি বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ স্থানে এত হৃদয়গ্রাহী প্রমোদোদ্যান নির্মিত হয় যে, ইব্‌নে-তুলুনের মসজিদের দ্বারদেশ হইতে জুবিলা দ্বার দৃষ্টিগোচর হইত। এখনো কায়রোর দুর্গ-প্রাচীর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এইগুলির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

কাহারও কাহারও অনুমান, বিগত রাজবংশের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই সালাহ্‌উদ্দিন কায়রো দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু ইহার আরও গুরুতর কারণ ছিল। সিরিয়ার প্রত্যেক নগরেই একটি দুর্গ থাকিত। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, নগর বিজিত হইলেও বহু ক্ষেত্রে দুর্গ অবিজিত থাকিয়া যাইত। এমন কি এই আশ্রয়-স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নাগরিকেরা অনেক সময় শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া নগর পুনরাধিকার করিতেও সমর্থ হইত। কাজেই কায়রোতেও এরূপ একটি দুর্গ নির্মাণের খুবই প্রয়োজন ছিল। এমন কি খোদ নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যও ইহার দরকার হইতে পারিত। মিসরের মস্‌জিদসমূহে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত এবং মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত হইলেও সালাহ্‌উদ্দীন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। নূরুদ্দীন ইহা বেশ জানিতেন; কিন্তু রুমের সুলতান ও ফ্র্যাঙ্কদের সহিত নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় মিসরের রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা খর্বের অবসর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

সালাহ্‌উদ্দীনও বরাবরই প্রভুর সংস্রব এড়াইয়া চলিতেন। ফাতিমিয়া খলিফার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি মন্‌ট্‌রিয়েল দুর্গ আক্রমণ করেন। সিরিয়া ও মিসরের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ইহা ছিল উভয় রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য ও যাতায়াতের এক ভীষণ বিঘ্ন। তজ্জন্যই তাঁহার এই যুদ্ধ-যাত্রা। তিনি দুর্গ অবরোধ করিতে না করিতেই সংবাদ আসিল, নূরুদ্দীন তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য দামেশ্‌ক ত্যাগ করিয়াছেন। সালাহ্‌উদ্দীন তৎক্ষনাৎ শিবির ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে মিসরে চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় সুলতানকে লিখিলেন ফাতিমিয়া বংশের অনুকূলে এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া সংবাদ

পাওয়ায় তিনি অকস্মাৎ কায়রো যাইতেছেন। ষড়যন্ত্রের কথা সত্য হইলেও নূরুদ্দিন এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মিসরের শাসন কর্তার অবাধ্যতার অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ কায়রো পৌঁছিলে সালাহ্‌উদ্দীন ব্যাকুল হইয়া এক পরামর্শ সভা আহ্‌বান করিলেন। কিন্তু আসন্ন বিপদ বার্তা শ্রবণ করিয়াও সেনাপতিরা চুপ করিয়া রহিলেন। আইয়ুব ব্যাপার বুঝিয়া পুত্রকে বলিলেন, "তুমি সুলতানকে লিখিয়া দাও, 'আপনার যুদ্ধোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া অবাক্ হইলাম। শাহানশাহ্ একটিমাত্র লোক পাঠাইয়া দিলেই ত সে এই গোলামকে হুজুরের খেদমতে হাজির করিতে পারিবে। এমতাবস্থায় রণ-সজ্জার কি প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না।" এই বলিয়া তিনি সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেনাপতিরা চলিয়া গেলে তিনি পুত্রকে বলিলেন, 'আল্লার কসম, নূরুদ্দীন মিসরের একখানা ইক্ষুর জন্য হাত বাড়াইলেও আমি স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব। কিন্তু হিংসুকেরা ইহা জানিতে পারিলে তাঁহার ফল বিষময় হইবে।" সালাহ্‌উদ্দীন পিতার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলেন। আইয়ুবের দূর দৃষ্টি সার্থক হইল। মিসর অভিযান করিয়া না-হক্ বিপদের সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা সালাহ্‌উদ্দীনের বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট থাকাই নূরুদ্দীন বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

শীঘ্রই এই বাধ্যতার পরীক্ষা হইল। ১১৭৩ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে সালাহ্‌উদ্দীন প্রভুর আদেশে মরু সাগরের দক্ষিণস্থ করক দুর্গ অবরোধ করিলেন। সিরিয়ার পথে অবস্থিত বলিয়া মুসলমানদের নিকট ইহা একটি বড় কন্টক বিবেচিত হইত। গভীর পরিখা-বেষ্টিত একটি তুঙ্গ ঋজু শৈলোপরি অবস্থিত থাকায় দুর্গটি প্রায় অজেয় হইয়া পড়িয়াছিল। সালাহ্‌উদ্দীন ইহা অবরোধ করিলে নূরুদ্দীন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন, পূর্ব হইতেই এই রূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংকল্প টিকিল না। সুলতানের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি মিসরে চলিয়া গেলেন। নূরুদ্দীন পত্র পাইলেন, পিতার অসুখ। অসুখে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মিসরে বিদ্রোহ হইতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি এই যুক্তি সদ্‌ভাবেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হায়! সালাহ্‌উদ্দীন যখন মিসরে পৌঁছিলেন, আইয়ুবের পুণ্যাত্মা তখন স্বর্গ-পুরে। কারণ,

তিনি সৈন্যগণকে কুচ্-কাওয়াজ শিখাইবার সময় দৈবাৎ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হন। ফলে ৯ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতৃভক্ত পুত্র চোখের পানিতে বুক ভাসাইলেন। কিন্তু যিনি একবার পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া চলিয়া যান, তিনি কি কাহারও অশ্রুতে ফিরিয়া আসেন? পিতার মৃত্যুতে সালাহ্‌উদ্দিন একজন পরম হিতোপদেষ্টা হারাইলেন। তাঁহার এই ক্ষতি আর পূরণ হয় নাই।

দিগ্বিজয়

শোক-দুঃখ চিরকাল সমভাবে মনে থাকে না। থাকিলে সংসার অচল হইয়া যাইত। যতই দিন যায়, বিষাদ-স্মৃতিও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, মানুষও ক্রমে ক্রমে পুনরায় কর্তব্যে মনোনিবেশ করে। ইহাই প্রকৃতির রীতি। পিতৃ-শোক কমিয়া আসিলে সালাহ্উদ্দীন নানা কারণে রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সেনাপতি কারাকুশ ইতিপূর্বেই কাবেশ পর্যন্ত বার্কা ও ত্রিপোলীর সমগ্র অংশ দখল করিয়া লন। তাঁহার বিরাট বাহিনীকে কার্যে রত রাখিবার এবং মালে গাণীমাত ও পুরস্কারের অর্থে তাহাদের তুষ্টিসাধন করিবার জন্যই এই অভিযান পরিচালিত হইত। কায়রোর ষড়যন্ত্রকারী কর্মচারী ও বিদ্রোহী কাফ্রীদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য ১১৭৩ খৃস্টাব্দে তিনি সূদানে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহার আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। নূরুদ্দীন বাহ্যতঃ তাঁহার প্রতি মিত্র-ভাব দেখাইলেও অন্তরে শত্রুতা পোষণ করিতেন। যদি মিসরে টিকিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে, তবে তিনি সূদান অথবা দক্ষিণ আরবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন। এত দূরদেশে নূরুদ্দীনের পক্ষে তাঁহার অনুসরণ করার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। দুর্ধর্ষ তুরাণ শাহ্ কিরূপে সফলতার সহিত কাফ্রী দমন করিয়া ইব্রিম নগর দখলে আনিয়া সূদান জয় সম্পূর্ণ করেন, তাহা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভূট্টার দেশে প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে দগ্ধ হইয়া একটি নিয়ত-বিবাদ-মান জাতিকে দাবাইয়া রাখিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করা তাঁহার ভাল লাগিল না। কিছুদিন অবস্থানের পর বহু ক্রীতদাস সহ কায়রো প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ভ্রাতাকে খবর দিলেন, সূদান তাঁহার কাজে লাগিবে না।

বাকী রহিল ইয়ামেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক-কবি ওমারা তখন কায়রোতে অবস্থান করিতেছিলেন। আইয়ুব পরিবারের বিরুদ্ধে সেখানে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে

তুরাণ শাহের ন্যায় দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে কায়রো হইতে অপসৃত করিবার জন্য তিনি পঞ্চমুখে তাঁহার জন্মভূমির গুণ-গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার মতলব বদ্ হইলেও প্রশংসা-বাক্য ছিল অনেকটা সত্য। সৌন্দর্য্য ও উর্বরতার জন্য প্রাচীনকালে ইয়ামেনকে 'সুখী আরব' বলা হইত। সালাহ্উদ্দীন ও উহা সদ্ভাবে গ্রহণ করিলেন। একদল সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ১১৭৪ খৃস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তুরাণ শাহ্ ইয়ামেন জয়ে বহির্গত হইলেন। মক্কায় উপস্থিত হইলে তথাকার একজন শক্তিশালী আমীর তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ইয়ামেন বাসীরা তাঁহাকে প্রাণপণে বাধা দান করিল। কিন্তু তুরাণ শাহের প্রবল পরাক্রমের বিরুদ্ধে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। জেবেদ, জেনেদ, আদন, সানা প্রভৃতি নগর ও দুর্গ একে একে তাঁহার দখলে আসিল। ফলে আগষ্ট মাসের মধ্যেই ইয়ামেন জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। তায়েজ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১১৭৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নব-বিজিত রাজ্যের শাসন-কার্য চালাইয়া পর বৎসর তিনি ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইয়ামেন ৫৫ বৎসর যাবত আইয়ুব বংশের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু নূরুদ্দীনের প্রতিহিংসা হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য সালাহ্উদ্দীনকে কখনও এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই।

ইতিমধ্যে সালাহ্উদ্দীনের বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইতেছিল। ওমারা ছিলেন উহার প্রধান উদ্যোক্তা। বহু মিসরী, সুদানী—এমনকি কিছু সংখ্যক তুর্ক সৈন্য ও কর্মচারী পর্যন্ত ইহাতে যোগদান করেন। অর্থ ও রাজ্য লোভে সিসিলী ও জেরুজালেমের রাজারা ষড়যন্ত্রকারিগণকে নৌ-বাহিনী দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ জনৈক পুরোহিত এই ষড়যন্ত্রের খবর রাখিতেন। তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া সালাহ্উদ্দীন এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে পুরোহিতের বর্ণনা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় এক দিন তিনি অকস্মাৎ ষড়যন্ত্রকারী-দিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ১১৭৪ খৃস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ওমারা ও অন্যান্য নেতা ফাঁসী-কাষ্ঠে আত্মাহুতি দিলেন। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা উত্তর মিসরে নির্বাসিত হইল।

ষড়যন্তকারীদের শোচনীয় পরিণাম জানিতে পারিয়া প্যালেষ্টাইনের ক্রুসেডারেরা মিসর গমনে বিরত হইল। কিন্তু এই সংবাদ সিসিলী-

রাজের কানে উঠিল না। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহার ৬০০ যুদ্ধ-জাহাজ ৩০০০০ সৈন্য লইয়া মিসর যাত্রা করিল। ২৮শে জুলাই এই বিরাট নৌ-বহর আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে হাজির হইল। দুর্গে তখন রক্ষী-সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাহাদের প্রাণপণ বাধা উপেক্ষা করিয়া খৃস্টানেরা বাতি-ঘরের নিকট নামিয়া পড়িল। পরবর্তী দুইদিনে তাহারা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রাচীর-মূলে উপস্থিত হইল। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে সাহায্যকারী লোক আসিয়া রক্ষী-সৈন্যদের সহিত যোগদান করায় খৃস্টানেরা শেষে পশ্চাতে হটিয়া গেল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া মুসলমানেরা পরদিন তীব্র বেগে শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইল। নগর দ্বারে ফিরিয়া আসিয়াই তাহারা সংবাদ পাইল, সালাহ্‌উদ্দীনের সৈন্যেরা নিকটে উপস্থিত। নতুন উৎসাহে তাহারা রাত্রিকালেই আবার খৃস্টান শিবির আক্রমণ করিয়া বসিল। শত্রুরা তাহাদের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। তাহাদের কেহ মুসলমানদের হস্তে নিহত হইল, কেহ সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা জাহাজে উঠিয়া নিশাবসানের পূর্বেই স্বদেশে পলাইয়া গেল।

ভাগ্যবান সালাহ্‌উদ্দীন শীঘ্রই আরও বৃহত্তর সঙ্কটের হাত হইতে রেহাই পাইলেন। কণ্ঠ ফুলিয়া ১৫ই মে সিরিয়া-রাজ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সালাহ্‌উদ্দীন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

সিরিয়া জয়

'কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সর্বনাশ।' নূরুদ্দীন মরিলেন। আর তাহারই ফলে সালাহ্উদ্দীন বাগদাদ ও কার্থেজের মধ্যবর্তী বিশাল ভূ-ভাগের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতিতে পরিণত হইলেন। বিগত সুলতানের পুত্র সালেহ্ ইস্মাঈলের বয়স তখন মাত্র এগার বৎসর। কাজেই তিনি অভিভাবকদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জঙ্গীর রাজ্য ছারখার হইতে বসিল। এই বৎসরের (১১৭৪ খৃঃ) জুলাই মাসে আমালরিকের মৃত্যু হওয়ায় খৃস্টান রাজ্যেরও মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তৎপুত্র বল্ডুইন ছিলেন একেত বয়সে বালক, তদুপরি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ত্রিপোলীসের রেমণ্ড তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ঈর্ষাপরায়ণ পরামর্শদাতাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক জন ক্ষমতাশালী নরপতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা এই বালক ভূপতি-দ্বয়ের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশেই সালাহ্উদ্দীনের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী রাজার পক্ষে প্রতিবেশীদের দৌর্বল্যের সুযোগে রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি সজ্ঞানে মনোমধ্যে এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, একথা বলিতে গেলে তাঁহার চরিত্রে অযথা কলঙ্কারোপ করা হইবে।* ইস্লাম ও মুসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য সিরিয়ার ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে তিনি ভূতপূর্ব প্রভুর রাজের বিনিময়ে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে নিশ্চিতই ইতস্ততঃ করিতেন। জঙ্গী ও তাঁহার সন্তানের কঠোর পরিশ্রমে সুগঠিত রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী আমীর—এমনকি খৃস্টানদেরও হস্তগত হইতেছে, এই মর্মান্তিক দৃশ্য না দেখিলে তিনি কিছুতেই সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতেন না।

নূরুদ্দীনের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য মধ্যে অনৈক্য ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। বলক-রাজার খুল্লতাত ভ্রাতা দ্বিতীয় সায়ফুদ্দীন

* "...to ascribe any such conscious motive to him would be to misread his character,"—Lane-poole, 134.

গাজী বিদ্রোহী হইয়া এডেসা প্রভৃতি কয়েকটি করদ-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। অনেক প্রধান জায়গীরদারও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মুস্‌লিম-সিরিয়া নেতৃহীন হইয়া পড়িল। ফ্র্যাঙ্কেরা তাহাদের ন্যায় দূরবস্থাপন্ন না হইলে জঙ্গীর ছিন্ন-বিছিন্ন সাম্রাজ্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত। এই ঘোর বিপদে সালাহ্‌উদ্দীন বিগত সুলতানের প্রধান কর্মচারীরূপে স্বভাবতঃই বালক-রাজাকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। তিনি দূত মারফতে সালেহ্‌কে নিজের অবিচলিত রাজভক্তির কথা জ্ঞাপন করিয়া খুৎবায় তাঁহার মঙ্গল কামনার আদেশ জারি করিলেন। মিসরের মুদ্রায় তাঁহার নাম ক্ষোদিত করারও ব্যবস্থা হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিরিয়ার আমীরদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভৎর্সনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তাঁহারা বহু অর্থ দিয়া খৃস্টানদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ওদিকে মেসোপটেমিয়া-রাজের বিজয়-গতি অবাধে চলিতে লাগিল। দামেশ্‌কের সভাসদেরা তাহা প্রতিরোধের চেষ্টা না করিয়া আগষ্ট মাসে বালক রাজাকে আলেপ্পো পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। শাসনকর্তা গুমশ্‌তিগিন সালেহ্‌ ইসমাঈলের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী আমীরগণকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য দামেশ্‌ক আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে তাঁহারা প্রথমে বহুদিন মসুলের রাজার সাহায্য চাহিলেন। তিনি অস্বীকার করায় নিরুপায় হইয়া তাঁহারা সালাহ্‌উদ্দীনের শরণাপন্ন হইলেন। প্রভুর স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল।

মাত্র ৭০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া সালাহ্‌উদ্দীন মরুপথে দামেশ্‌ক যাত্রা করিলেন। নাগরিকেরা তাঁহাকে মহাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিল। ২৮ শে নভেম্বর কিল্লাদার দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দলে দলে লোক নগরে জড় হইতে লাগিল। সালাহ্‌উদ্দীন মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদের প্রশংসা অর্জন করিলেন। কিন্তু সেখানে বেশীদিন বসিয়া থাকার উপায় ছিল না। তুগ্‌ তিগিনের হস্তে দামেশ্‌কের শাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি বিদ্রোহী জনপথ পুনরধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রবল শীত ও তুষার-পাত উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সৈন্যেরা ৯ই

ডিসেম্বর এমেসা নগরে প্রবেশ করিল। কয়েকদিন পরে তিনি হামায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর আলেপ্পোর ধূসর দুর্গের সম্মুখে তাঁহার তাঁবু পড়িল। কিন্তু গুমশ্‌তিগিন কিছুতেই তাঁহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। কাজেই ৩০ শে ডিসেম্বর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। সালেহ্ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নাগরিকদের দয়া ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার মর্মস্পর্শী অনুরোধে বিচলিত হইয়া তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে অবরোধকারীদিগকে বাধাদান করিতে লাগিল।

এদিকে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। সালাহ্‌উদ্দীনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া গুমশ্‌তিগিন গুপ্তঘাতকদের সর্দার 'শায়খুস্-সিনানে'র (পার্বত্য বৃদ্ধ) সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কতকটা ধর্মোদ্দেশ্যে হইলেও প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণেই এই ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণস্থ আন্‌সারিয়া পর্বতমালার মধ্যবর্তী আলামুৎ দুর্গ ছিল ইহাদের আড্ডা। গুপ্তহত্যায় ইহারা অত্যন্ত দক্ষতা অর্জ্জন করে। ইহাদের চরেরা 'ফেদায়ী' নামে অভিহিত হইত। সমগ্র সিরিয়া ইহাদের ভয়ে নিয়ত থর থর করিয়া কাঁপিত। ইহারা ইস্‌মাঈলিয়া বা 'বাতিনী' অর্থাৎ গুপ্ত সম্প্রদায় বলিয়াও অভিহিত হইত। সাধারণ লোকেরা ইহাদিগকে 'হাশ্‌শাশিন' বা গাঁজাখোর বলিয়া ডাকিত। নূরুদ্দীন একবার এই ভীষণ-প্রকৃতি গুপ্ত-ঘাতকদিগকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একদা তাঁহার তাকিয়ার নিকট সাবধান-বাণী সহ একখানা বিষাক্ত ছুরিকা দেখিতে পাইয়া তিনি এই অসম্ভব কার্য হইতে নিরস্ত হন। কিন্তু ফাতিমিয়া বংশে উদ্ভব বলিয়া মিসরের বিগত রাজবংশের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি ফেদায়ী-দের সহানুভূতি ছিল। কাজেই শায়খুস-সিনান সহজেই গুমশ্‌তিগিনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আর সলাহ্‌উদ্দীনকে হত্যা করিবার জন্য কয়েকজন ফেদায়ী প্রেরিত হইল। তাহারা বিনা বাধায় শিবিরে প্রবেশ করিলেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িল। এক দুর্ভাগা সালাহ্‌উদ্দীনের শিবির মধ্যেই নিহত হইল, অন্যান্য দুর্বৃত্ত আত্মরক্ষার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়া শেষে মৃত্যু বরণ করিল।

এইরূপে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়া সালাহ্‌উদ্দীন আর না-হক্ বিপদগ্রস্ত হইতে চাহিলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাকে অন্যান্য

দিক্ হইতেও বিপদ-জালে জড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মসুল-রাজ তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতার সাহায্যার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। ফ্রাঙ্কেরা পূর্বেই তাঁহার দামেশ্‌কে প্রত্যাবর্তন-পথ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। ওদিকে গুমশ্‌তিগিনের অনুরোধে কাউণ্ট রেমণ্ড এমেসা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সংবাদ পাইয়াই সালাহ্উদ্দীন আলেপ্পোর অবরোধ উঠাইয়া সেদিকে ছুটিলেন। তিনি ওরোণ্টস্ নদীর বিরাট প্রস্তর-সেতুর নিকটবর্তী হইলে ফ্রাঙ্কেরা স্বরাজ্যে পলাইয়া গেল। সালাহ্উদ্দীন নিবিবাদে নগরে প্রবেশ করিলেন। ভীষণ অবরোধের পর মার্চের (১১৭৫) মধ্যভাগে দুর্গের পতন ঘটিল। এই মাসের শেষভাগে বা-আলবেক নগরীও তাঁহার হস্তগত হইল। ফলে তিনি আলেপ্পোর খাস দখলীয় জিলাগুলি ভিন্ন সমগ্র সিরিয়া রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন।

সালাহ্উদ্দীনের কৃতকার্যতায় অবশেষে সায়ফুদ্দীন গাজীর চক্ষু ফুটিল। খুল্লতাত ভ্রাতার কৈশোরের সুযোগে তাঁহার কিছু রাজ্যাংশ গ্রাস করিতে তাঁহার বিবেকে বাধে নাই। কিন্তু জঙ্গীবংশের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের পারিবারিক সম্পত্তিতে ভাগ বসাইবেন, ইহা তাঁহার নিকট নিতান্ত বিষদৃশ মনে হইল। কাজেই তিনি আপাততঃ গৃহ-যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া এক বিরাট বাহিনী সহ আলেপ্পো যাত্রা করিলেন। সালেহ্ ইস্‌মাঈলের সৈন্যেরা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে সম্মিলিত বাহিনী সালাহ্উদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম বলিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব উঠাইলেন। কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে রূঢ় বাক্যে মিসরে প্রত্যাবর্তনের জন্য আদেশ পাঠাইল। বাধ্য হইয়া সালাহ্উদ্দীন কুরুণ-হামা বা হামা-শৃঙ্গে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া ১১৭৫ খৃস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল শত্রু পক্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করা মাত্রই কায়রো ও দামেশ্‌কের সুশিক্ষিত প্রবীণ সৈন্যরা উভয় দিক্ হইতে তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। যাহারা ভাগ্যবলে জীবিত রহিল, তাহারা ভীরুর ন্যায় রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। সালাহ্উদ্দীন তাহাদিগকে আলেপ্পো পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। এবার বালক-রাজার পরামর্শদাতারা তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। শর্তানুসারে প্রত্যেক পক্ষই স্বাধিকৃত জনপদ নিজের

দখলে রাখিলেন। ফলে সালাহ্উদ্দিন হামা, এমেসা ও দামেশ্ক প্রদেশের নির্বিরোধ প্রভু হইলেন। তাহা ছাড়া আলেপ্পোর অদূরবর্তী মার্রা, বারিণ, কাফারতাব প্রভৃতি নগরাবলীও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

স্বাধীন সুলতান

এতদিন সালাহ্উদ্দীন সালেহ্ ইসমাঈলের অধীনে মিসরের আমীর মাত্র ছিলেন। আলেপ্পোর সন্ধির পর তিনি সর্বপ্রথম সুলতান বা রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এখন হইতে খুৎবা ও মুদ্রায় সালেহ্ ইস্মাঈলের নাম রহিত হইল। সিরিয়া ও মিসরের যাবতীয় মস্জিদে ইমামেরা তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া খুদাতা'লার নিকট দোয়া করিলেন। কায়রো ও আলেক-জান্দ্রিয়ার টাকশাল হইতে তাঁহার নামে মুদ্রা বাহির হইল। এই তারিখের স্বর্ণ-মুদ্রা অদ্যাপি কায়রোর যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

লেনপুল বলেন, "সালাহ্উদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রায়ই রাজ-দ্রোহের অভিযোগ আনীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে যুক্তির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সিরিয়ার নাম মাত্র রাজা সালাহ্উদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিদের ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। তিনি কখনও তাঁহাকে রাজভক্তি প্রকাশের সুযোগ দেন নাই। সালাহ্উদ্দীন সিরিয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিলে উহা বালক-রাজার পরিবর্তে অন্যান্য উচ্চাকাঙ্খী আমিরেরই হস্তগত হইত।" অথচ ইস্লামের স্বার্থের খাতিরে তখন নিকট-প্রাচ্যের ঐক্য বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সালাহ্উদ্দীনের কথায় ও কার্যে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্বস্ততার সহিত প্রভু-পুত্রের খেদমত করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সালেহ্ স্বভাবতঃই মনে করেন, এরূপ খেদমত প্রভুত্বেরই নামান্তর মাত্র। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হন নাই। মিলনের সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করাসত্ত্বেও ব্যর্থকাম হইয়া নিজেকে রাজভক্তির দায়িত্ব-মুক্ত মনে করা সালাহ্উদ্দীনের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় তিনি কেন যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন না, তাহার কোনই যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে 'সিরিয়া ও মিসরের সুলতান' বলিয়া স্বীকার করিয়া যথারীতি সনন্দ ও অভিষেক পরিচ্ছেদ পাঠাইয়া দিলেন। ইসলামের উর্ধতন কর্তার অনুমোদন লাভ করায় তাঁহার রাজ উপাধি বৈধ হইয়া গেল।

হামা-শৃঙ্গেই আইয়ুব ও জঙ্গী বংশের বিবাদের শেষ হইল না। উভয় পক্ষই ভাবী সংগ্রামের জন্য যথাসাধ্য শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সাইফুদ্দীন দিয়ার, বকর ও জজিরার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে ৬০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিরায় ফোরাত নদী উত্তীর্ণ হইলেন। শীঘ্রই আলেপ্পো বাহিনী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। সালাহ্‌উদ্দীনও মিসর হইতে সৈন্য সাহায্য পাইলেন। ১১৭৬ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি ওরোণ্টস্ নদী অতিক্রম করিলেন।

সেদিন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ছিল। ধরণী একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এমনকি মধ্যাহ্নেও নক্ষত্রমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হয়। হামা ছাড়াইয়া অধিক দূর না যাইতেই সালাহ্‌উদ্দীন এই দুর্লক্ষণের মর্ম বুঝিতে পারিলেন। সেখানে তিনি কেবল দৈবানুগ্রহে এক ভীষণ বিবাদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা জেবাবুত্ তুর্কে (তুর্কের কূপ) ঘোড়াগুলিকে পানি পান করাইবার জন্য ছড়াইয়া পড়িল। এমন সময় সাইফুদ্দীন অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে হাজির হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিলে জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সালাহ্‌উদ্দীন সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া তেলুস সুলতান বা সুলতান শিলোচ্চয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পরদিন ২২শে এপ্রিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। ইব্রিল অধিপতি মিসর বাহিনীর দাক্ষিণাংশ পরাজিত করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ইহা দেখিয়া সুলতান স্বয়ং তাঁহার দেহরক্ষীদলসহ শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার তুমুল আক্রমণে বিপক্ষ বাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ণ করিতে লাগিল। আতাবেবোর অধিকাংশ কর্মচারীই নিহত ও বন্দী হইলেন। তিনি অতিকষ্টে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। তাঁহার অশ্ব, শিবির, রসদ-পত্র ও ধনাগার সমস্তই বিজেতার হস্তগত হইল। সালাহ্‌উদ্দীন নিজেকে মহান বিজয়ী বলিয়া প্রমাণিত করিলেন। বন্দীরা বিনা-শর্তে মুক্তি পাইল। অনেকেই বিবিধ উপহার লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার জয়গান করিতে করিতে স্বদেশে প্রস্থান করিল। আহত সৈন্যদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। মালেগাণীমাতের কিছুই নিজে গ্রহণ

না করিয়া সমস্তই সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। ফলে তাহারা তাঁহার আদেশে জান কোরবাণী করার জন্য প্রস্তুত হইল।

সৈন্যদের উত্তেজনা হ্রাস পাইবার পূর্বেই সালাহ্উদ্দীন তাহাদিগকে সমুখে পরিচালিত করিলেন। পরদিন মানবিজ তাঁহার হাতে আসিল। ১৫ই মে মিসর-বাহিনী সুদৃঢ় আজাজ দুর্গ অবরোধ করিল। ৩৮ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ চলিল। ইহাতে আক্রমনকারীদের গুরুতর ক্ষতি হইল। এমনকি স্বয়ং সালাহ্উদ্দীনের জীবন বিনষ্ট হইতে বসিল। ২২শে মে তিনি শিবিরে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। এমন সময় এক ফিদায়ী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তকে ছুরি বসাইয়া দিল। সৌভাগ্যবসতঃ পাগ্ড়ীর নিম্নে লৌহ-টুপি থাকায় ছুরির আঘাতে কিছুই হইল না। সালাহ্উদ্দীন বিদ্যুৎ বেগে ঘাতককে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দস্যু সজোরে হাত ছাড়াইয়া পুনরায় তাঁহার কণ্ঠদেশে আঘাত করিল। ইহাতে তাঁহার গলবন্ধ কাটিয়া গেল। কিন্তু লৌহবর্ম আকণ্ঠ বিস্তৃত ছিল বলিয়া এই আঘাত ব্যর্থ হইল। এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতে এক মুহূর্তও লাগিল না। ইতিমধ্যে প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া দুর্ভাগ্য ফিদায়ীকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। তাহার পতনের পর দ্বিতীয় ঘাতক দৌড়িয়া আসিয়া সালাহ্উদ্দীনের কণ্ঠে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রহরীরা তাহাকেও পরপারে পাঠাইয়া দিল। ইহাতেও বিপদ কাটিল না। আর একজন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণের প্রয়াস পাইল। কিন্তু ততক্ষণে প্রহরীরা অত্যন্ত সতর্ক হইয়া পড়ায় তাহার চেষ্টাও সফল হইল না

তদন্ত করিয়া দেখা গেল দস্যুরা সুলতানের দেহরক্ষীদলের মধ্যেই ভর্তি হইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। সেই মুহূর্তেই দেহরক্ষী পরিবর্তিত হইল। আর কোন গুপ্তঘাতক লুকাইয়া আছে কিনা তাহারও অনুসন্ধান চলিল। সৌভাগ্যবশতঃ আর কাহারও খোঁজ মিলিল না।

সালাহ্উদ্দীনের দৃঢ় বিশ্বাস হইল গুমশ্তিগিনই এই হীন প্রচেষ্টার নায়ক। কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষাদানের পূর্বে আজাজ অধিকার প্রয়োজন। সেই জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে অবরোধ আরম্ভ হইল। ২১শে জুন দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। সেদিনই তিনি আলেপ্পোর দিকে ধাবিত হইলেন। ২৫শে জুন তৃতীয় বার সুবিখ্যাত ধুসর দুর্গ

অবরুদ্ধ হইল। নাগরিকেরা পূর্বের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু অচিরে নগর-মধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইল। কায়ফা ও মারিদিনের অর্তুক বংশীয় শাহাজাদারা পূর্ব হইতেই মিসর রাজের সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। ২৯শে জুন ইহাদের ও সালেহ্ ইস্‌মাইলের সঙ্গে সালাহ্‌উদ্দীনের এক সন্ধি হইল। সেই অনুসারে তিনি সমগ্র বিজিত রাজ্যের মালিকবলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

সন্ধি-শেষে সালেহ্ ইসমাইলের এক অল্প বয়স্কা ভগিনী সালাহ্‌উদ্দীনের নিকট আসিলেন। তিনি স্নেহভরে তাঁহার আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাহ্‌জাদী উত্তর দিলেন, 'আজাজ'। মহামতি সুলতান তৎক্ষণাৎ দুর্গটি প্রভুপুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। শাহ্‌জাদীও বহু মূল্যবান উপহার পাইলেন। সুলতানের কর্মচারীরা তাঁহাকে আলেপ্পোর সিংহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। পরাজিত শত্রুর প্রতি সালাহ্‌উদ্দীনের এত মহানুভবতা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গেল।

গুপ্ত ঘাতকের দেশে

ছয় বৎসর পর্যন্ত সালাহ্উদ্দীন ও জঙ্গী বংশের মধ্যে শান্তি বিরাজিত রহিল। সালেহ্ ইসমাইল নির্বিঘ্নে তাঁহার পিতৃরাজ্যের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিতে লাগিলেন। মসুলের আতাবেগও কুরুণ-হামা ও তেলুস সুলতানের শোচণীয় পরাজয়ের পুনর্নিমন্ত্রণে সাহসী হইলেন না। ১১৭৫ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে খৃস্টানদের সঙ্গেও এক সন্ধি হইল। কিন্তু অবিশ্বাসীদের সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন। কারণ, ইহাই ছিল সে যুগের খৃস্টান-জগতের অবলম্বিত নীতি। কাজেই তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করার কোনই মূল্য ছিলনা। অল্পকাল পরেই তাহারা লিটানী উপত্যাকার অধিবাসীদের শস্যাগার ও ঘরবাড়ী দগ্ধ করিয়া বিপুল যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য ও পশুপাল লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেল। সালাহ্উদ্দীন আপাততঃ এদিকে মনোযোগদিতে পারিলেন না। কারণ, যে পর্যন্ত শায়খুস-সিনান উপযুক্ত শিক্ষা না পান, সে পর্যন্ত তাঁহার জীবন কিছুতেই নিরাপদ ছিলনা। সেই জন্য আলেপ্পোর দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়া মাত্রই তিনি মিসর বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ আনসারিয়া পর্বতমালায় প্রবেশ করিলেন।

এক মাসেই (আগষ্ট) এই অভিযান সমাপ্ত হইল। গুপ্তঘাতকদের রাজ্যের বহুস্থান বিনষ্ট করিয়া তিনি তাহাদের প্রধান দুর্গ মাসয়্যাফ অবরোধ করিলেন। কিন্তু এক দুরারোহ গিরি-শৃঙ্গে অবস্থিত ছিল বলিয়া তাঁহার অবরোধ-যন্ত্রসমূহ ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিলনা। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি এখানে অবস্থানের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। কোন নরঘাতক তাঁহার শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে যাহাতে তাহার পদ-চিহ্ন ধরা পড়ে, তাহার জন্য চতুস্পার্শ্বে খড়ি-মাটি ছড়াইয়া রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত সাবধানতাই ব্যর্থ হইয়া গেল।

*Treaties with the Soldiers of the cross—were worse than no hing-So long as the doctrine prevailed in christendom that no faith need be kept with the imfidel"—Lane poole, 147.

পার্বত্য বৃদ্ধ প্রহরীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াই হউক, কিংবা তাহাদিগকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়াই হউক, রাত্রিকালে সুলতানের শিবিরে আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বিষাক্ত ছুরিকা সহ একখানা পত্র রাখিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিলেন। 'জয় ও সুলতানের জীবন দুইই ঘাতক রাজের হাতে। তাঁহাকে বশীভূত করার ক্ষমতা সালাহ্‌উদ্দীনের নাই।' ইহাই পত্রের মর্মার্থ এবং পত্রপাঠে ও ছুরিকা দর্শনে নিদ্রোত্থিত সুলতানের আতঙ্কের সীমা রহিলনা। তিনি দেখিলেন, দুর্গম পার্বত্যদেশে অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া দুরারোহ শৈল-শৃঙ্গ হস্তগত করা এক প্রকার অসম্ভব। তদুপরি যে প্রত্যক্ষ শয়তান শত শত প্রহরী বেষ্টিত শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। বৃদ্ধকে দমন করা যখন সম্ভব, তখন তাঁহাকে বন্ধু শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলেও রাজ-নীতির দিক দিয়া কম লাভ নহে। তাহার জন্য তিনি সন্ধির কথা-বার্তা স্থির করিবার জন্য শায়খুস্-সিনানের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু অবরোধ ত্যাগ না করা পর্যন্ত বৃদ্ধ শান্তির প্রস্তাব বিবেচনা করিতে রাজী হইলেননা। বাধ্য হইয়াই সালাহ্‌উদ্দীনকে অবরোধ উঠাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিতে হইল। তিনি ইবনে মুস্কিদের সেতুর নিকট উপস্থিত হইলে শায়খুস্-সিনান ভবিষ্যতে তাঁহার কোনো ক্ষতি করিবেন না বলিয়া এক অঙ্গীকার পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মিসরের সিয়ারা পার্বত্য বৃদ্ধের সাহায্যে তখনও ফাতিমিয়া প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। অপরদিকে ক্রুসেডারেরাও তাহাদের এক গুপ্ত অস্ত্র চিরতরে বঞ্চিত হইল। কিন্তু বৃদ্ধ বাস্তবিকই তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন এবং আর কখনও ফিদায়ীরা সালাহ্‌উদ্দীনের প্রাণ নাশের চেষ্টা করে নাই। এইদিক দিয়া ক্রুসেডারদের অপেক্ষা ঘাতক-রাজই অধিক প্রশংসা লাভের যোগ্য।

গুপ্তঘাতকদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন ২৫শে আগষ্ট দামেশ্‌কে ফিরিয়া আসিলেন। তুরাণ শাহ্‌কে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি দুই বৎসর পর কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার তিনি তাঁহার বাঞ্ছিত দুর্গ নির্মাণের অবসর পাইলেন। কায়রোর বাহিরে গিজার বিরাট বাঁধ তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহা সাত মাইল দীর্ঘ ও চল্লিশটি

খিলানের উপর স্থাপিত। মূর জাতির আক্রমণে বাধা দানের জন্য ১১৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়। কিন্তু তাহারা কখনও মিসর আক্রমণ করে নাই।

প্যালেস্টাইন অভিযান

রাজধানীর দৃঢ়তা সাধন, শাসন-সৌকর্য্যের ব্যবস্থা ও তরবারি নির্মাতাদের দোকানের ন্যায় মাদ্রাসা স্থাপনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া সালাহ্উদ্দীন পূর্ণ এক বৎসর কাল কায়রোতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু খৃস্টানেরা তাঁহাকে দীর্ঘকাল শান্তিতে থাকিতে দিলনা। বরং তাহারা দামেশ্ক প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া সালাহ্উদ্দীনকে খেপাইয়া তুলিল। ফলে সালাহ্উদ্দীন ১১৭৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বরমাসে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু খৃস্টানরা তখন আলেপ্পো-রাজের অধিকারভুক্ত হারিম অবরোধে ব্যাপৃত। এই সুযোগে সালাহ্উদ্দীন ২৬০০০ সৈন্য লইয়া আস্কালনের দিকে অগ্রসর হইলেন। রমনা ও লিদ্যায় তিনি বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করিলেন। অপরদিকে সারাসেনেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া জেরুজালেমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

এদিকে রাজা বল্ডুইন আস্কালনে প্রবেশ করিলেন। অচিরে গাজার টেম্পালার নাইটেরা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গর্বিত সারাসেনেরা এই সম্মেলনে বাধা দেওয়া আদৌ আবশ্যক মনে করিলনা। শত্রুরা যাহাতে তাহাদিগকে আকস্মিক আক্রমণে বিপদগ্রস্ত করিতে না পারে, সেইজন্য তাহারা কোন সতর্কতা অবলম্বনেও মনোযোগী হইল না। শীঘ্রই তাহাদিগকে এই অসাবধানতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ভোগ করিতে হইল।

২৫শে নভেম্বর। সারাসেন বাহিনীর অধিকাংশই চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। এমন সময় খৃস্টানেরা রমলার নিকটস্থ তেল-জেজারে সহসা তাহাদের উপর আপতিত হইল। তাহারা একত্র হওয়ার পূর্বেই শত্রু সৈন্যেরা তাহাদিগকে করবালাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিতে লাগিল। সালাহ্উদ্দীন সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার দেহরক্ষীরাই ভূপতিত হইতেছে দেখিয়া তিনি এক দ্রুতগামী উটে উঠিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। আহত সৈন্যেরা বিনা চিকিৎসায় সেখানে পড়িয়া রহিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া রজনীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বহু

কল্টে মিসরে উপস্থিত হইল। যে সকল সৈন্য তেলজেজারে অনুপস্থিত ছিল, শীত, দুর্ভিক্ষ ও বারিপাতের প্রকোপে তাহাদেরও অতি অল্পই দেশে ফিরিতে পারিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সালাহ্‌উদ্দীনকে কখনও এত বিপন্ন হইতে হয় নাই।

একদল চমৎকার সৈন্য বিনষ্ট হইলেও সালাহ্‌উদ্দীন নিরুৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নবীন উদ্যমে পুনরায় নূতন সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সৈন্য ও রসদাদি সংগৃহীত হইয়া গেল। ১১৭৮ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে এমেসা নগরীর প্রাচীর নিম্নে সালাহ্‌উদ্দীনের তাঁবু পড়িল। উভয় পক্ষে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। হামার সৈন্যেরা এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য, খণ্ডিত মস্তক ও বন্দী লইয়া সালাহ্‌উদ্দীনের নিকট ফিরিয়া আসিল। মুসলিম জনপদ লুণ্ঠনও উৎসন্ন করার অপরাধে বন্দীরা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিল। অবশেষে শীতকাল দামেশ্‌কে কাটাইয়া বসন্তকালে সালাহ্‌উদ্দীন বলডুইনের বিগত চাতুরির প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে জেরুসালেম রাজ রমলার বিজয়ের সুযোগ গ্রহণে বিরত হন নাই। জর্ডন নদীর এক স্থান হাঁটিয়া পার হওয়া যাইত; তিনি সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন। উহার নাম হইল 'দুঃখ দুর্গ'। ইহার ফলে নদীপথ সুরক্ষিত হইল। আর 'দামেশ্‌কের শস্যাগার' বেনিয়াস প্রান্তরে গমন পথও বন্ধ হইয়া গেল। সারাসেনদের ক্ষতির কথা ভাবিয়া সালাহ্‌উদ্দীন রাজাকে এই সংকল্পত্যাগে সম্মত করাইবার জন্য প্রথমে ৬০,০০০ শেষে ১,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিলেন। কিন্তু বলডুইন কিছুতেই এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেননা। তখন সালাহ্‌উদ্দীন 'দুঃখ-দুর্গ' ভূমিসাৎ করার জন্য কসম করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুক শাহ্ স্বল্পমাত্র অনুচর সহ বেলফোর্টের নিকটস্থ একটি সরু পার্বত্য পথে বলডুইনকে ধরিয়া ফেলিলেন। সেইদিন ছিল ১১৭৯ সালের এপ্রিল মাস। কিন্তু তোরণের নির্ভিক হাম্ফ্রে নিজের প্রাণের বিনিময়ে সে যাত্রা যুবক রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সুযোগের অনুসরণ করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন জুন মাসে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। সারাসেনেরা সিদনের দিকে লুটপাট

আরম্ভ করিয়াছে শুনিয়া বল্‌ডুইনও সদ্য-প্রাপ্ত অপমান ঘুচাইবার জন্য সেদিকে ছুটিলেন।

মেসাফা গ্রামের নিকটে একটি গিরি-শৃঙ্গে উঠিয়া তিনি দেখিতে পইলেন, মর্জিয়ানের ময়দানে সালাহ্‌উদ্দীনের বিস্তৃত শিবিররাজি শোভা পাইতেছে। শত্রুপক্ষকে অকস্মাৎ আক্রমণের জন্য তাঁহার ভারি লোভ হইল। অত্যধিক দ্রুতধাবনের ফলে পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অশ্বারোহীরাও ভিন্ন ভিন্ন দলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এই বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ভাগ্য প্রথমে খৃস্টানদের প্রতিই প্রসন্নতা দেখাইল। তাহাদের প্রবল আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর একাংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইল। কিন্তু ওডো তাঁহার টেম্পলার নাইটদিগকে লইয়া বহুদূর পর্যন্ত পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করায় বিক্ষিপ্ত খৃস্টানেরা আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অনেকেই যুদ্ধ জয় হইয়াছে মনে করিয়া নিহত সৈন্যদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল। এই সুযোগে সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার পলায়নোদ্যত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া দ্রুতবেগে শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা একত্র হইবার অবসর পাইলনা। অধিকাংশ খৃস্টান নিহত বা বন্দী হইল। আর অবশিষ্ট সৈন্যেরা লিটানী নদী অতিক্রম করিয়া বেলকোর্ট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আবার কেহ কেহ এত ভীতিগ্রস্ত হইল যে, সিদনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কোথাও বিশ্রাম লইতে সাহসী হইল না। এই যুদ্ধে টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ, ত্রিপোলিসের রেমণ্ড, ইবেলিনের বেলিয়ান, রমলার বল্‌ডুইন, তাইবেরিয়াসের হাগ প্রভৃতি সত্তর জন বিখ্যাত নাইট সালাহ্‌উদ্দীনের হস্তে বন্দী হইলেন। বল্‌ডুইন দেড়লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা নিস্ক্রয় ও ১০০০ সারাসেন বন্দীকে মুক্তিদান করিয়া কারামুক্ত হইলেন। কিন্তু ওডো একজন মাত্র আমীরের বিনিময়েও মুক্তিলাভ করিতে অস্বীকার করিয়া কারাগার হইতে সোজা দোজকে চলিয়া গেলেন।'

এবার বল্‌ডুইনের মূর্খতার ফলে দুঃখ-দুর্গে গমন পথ পরিষ্কার হইল। অগ্রগামী সৈন্যেরা অধঃখননকারীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাক্ষা-কাণ্ড সংগ্রহ করামাত্রই সালাহ্‌উদ্দীন আক্রমণ আরম্ভ করিলেন প্রথমে একটি লোক ছিন্ন কামিজে দেহ আবৃত করিয়া এক লাফে দুর্গের বাহির হইয়া শত্রুপক্ষকে ব্যাস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইল।

অন্যান্য সৈন্য শীঘ্রই তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অবিলম্বে বহিঃদুর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসিল। কিন্তু রক্ষী সৈন্যেরা সাহায্য লাভের আশায় মূল দুর্গ প্রাচীর রক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষে সারাসেনেরা প্রাচীরের নিম্নে খাত কাটিয়া কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। কিন্তু প্রাচীরের বেধ সাড়ে তের হাত ছিল বলিয়া দুইদিন অবিরত অগ্নি জ্বলা সত্ত্বেও উহার পতনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। আর সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়াছে দেখিয়া সালাহ্‌উদ্দীন পানি ঢালিয়া আগুন নিভাইয়া দিলেন। খননকারীরা আবার আসিল। খাত গভীরতর ও প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া কাষ্ঠস্তূপে পুনরায় অগ্নি সংযোগ করা হইল। এইবার ৩০শে আগস্ট দুর্গ প্রাকার মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সারাসেনেরা ভগ্নস্থান দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ৭০০ রক্ষী সৈন্যকে বন্দী ও মুসলমান বন্দীদিগকে মুক্ত করিল। অধিকাংশ ফ্র্যাঙ্ক নিহত ও দুর্গ-মধ্যস্থ কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। দুর্গটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন স্থান ত্যাগ করিলেন।

অবশেষে জেরুসালেম-রাজ তাঁহার প্রিয় দুর্গের অবরোধ উঠাইতে আসিয়া অনল-কৃষ্ণ প্রস্তর-স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেননা। ক্রুসেডারেরা সালাহ্‌উদ্দীনের সহিত সে বৎসর আর বল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল না। বিগত শরৎকালে তাঁহার সত্তরটি যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রতট তচ্‌নচ্ করিয়া সহস্র খৃস্টান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি অবসর কাল এক শক্তিশালী নৌবহর গঠনে নিয়োজিত করিলেন। ১১৮০ খৃস্টাব্দের শরৎকালে তাঁহার স্থল বাহিনী সফেদের নিকট আসিয়া নৌবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বার বার শিক্ষা পাইয়া বল্‌ডুইন সাবধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। সালাহ্‌উদ্দীনের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া তাঁহার নিকট নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। কাজেই শান্তি স্থাপনের জন্য মুসলিম শিবিরে দূত ছুটিল। অনাবৃষ্টি ও শস্যাভাবের দরুণ সুলতানের সৈন্যদের রসদাদি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য তিনি ইহাতে নারাজ হইলেন না। জলে-স্থলে দুই বৎসরকাল যুদ্ধে বিরত থাকিতে স্বীকার করিয়া উভয়পক্ষ গ্রীষ্মকালে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ফ্র্যাঙ্কদের পক্ষে এই সন্ধি অত্যন্ত হীন কাজ। তাহাছাড়া, ইতিপূর্বে তাহারা কোন সুবিধা না

পাইয়া সমান শর্তে কখনও কোন সোলেহ্‌নামায় দস্তখত করে নাই। অধিকন্তু, বল্‌ডুইনের সহিত রেমণ্ডের তখন সদ্ভাব ছিল না। কাজেই তিনি এই সন্ধির প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু মে মাসে সালাহ্‌উদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্যেরা ত্রিপোলিসে ও তাঁহার নৌবহর টর্টোসার অদূরে উপস্থিত হইলে রেমণ্ডের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিছুদিনের জন্য ধর্মযুদ্ধ বন্ধ হইল।

অন্যান্য যে সকল শক্তি নিকট প্রাচ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও শীঘ্রই শান্তির পক্ষপাতী হইতে হইল। একটি বালিকা গায়িকা এই শান্তির উপস্থিত কারণ। কায়ফার শাহ্‌জাদা নূরুদ্দীন কুনিয়া বা রুমের সেলজুক সুলতান খিলিজ আরস্‌লনের কন্যার পানি গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি স্বীয় বেগমের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। এক অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকা গায়িকা তাঁহার প্রেমিকা হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষিতা রাণী পিতার নিকট নালিশ করিলেন। ফলে শ্বশুর জামাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন। আলেপ্পোর সন্ধি অনুসারে সালাহ্‌উদ্দীন নূরুদ্দীনের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। তদুপরি উত্তর সীমান্তের রা'বান দুর্গ লইয়া কুনিয়ার সুলতানের সহিত তাঁহার নিজেরও বিবাদ ছিল। কাজেই এক মহাযুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল। মীমাংসার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। রা'বানে উপস্থিত হইলে সেলজুক দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাদের প্রকৃত কারণ বুঝাইয়া দিলেন। ব্যাপার বুঝিয়া সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার প্রেমাসক্ত মিত্রকে বেগমের সহিত সদ্ব্যবহার না করার কারণ দর্শাইবার জন্য তাড়না করিলেন। নূরুদ্দীন বিশেষ উচ্চবাচ্য না করিয়া বালিকা গায়িকাকে রাজপুরী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে আপোষে বিবাদ মিটিয়া গেলে সালাহ্‌উদ্দীন মিলিসিয়া বা লেসার আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করিয়া আল্‌-মাসিসা পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তুর্ক মেষ পালকদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে রাজা রূপেনকে বাধ্য করাইয়াছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। আল্‌-মেনাকির দুর্গ বিধ্বস্ত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে সালাহ্‌উদ্দীনের ক্ষমতা এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ফোরাত হইতে ত্রিপলী পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তিনি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ উচ্চ পদ পাইলে

লোভের বশীভূত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন এক অতি মহৎ উদ্দেশ্যে স্বীয় ক্ষমতা ব্যবহার করিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে ১১৮০ খৃস্টাব্দের ২রা অক্টোবর সেঞ্চা নদীতটে এক চিরস্মরণীয় জাতীয় মহাসভা বসিল। এখানে মসুল, জাজিরা, ইব্রিল, কায়কা ও মারিদিনের শাহজাদাগণ এবং কুনিয়ার সুলতান ও আর্মেনিয়ার রাজা সালাহ্‌উদ্দীনের সহিত এক পবিত্র সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দুই বৎসর কাল শান্তিতে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মেসোপটেমিয়া জয়

মহাশান্তি স্থাপিত হইলে সালাহ্উদ্দীনের পক্ষে মিসর প্রত্যাবর্তনে আর কোন বাধা রহিলনা। ফররুখ শাহের হাতে সিরিয়ার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া ১১৮১ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি কায়রোতে ফিরিয়া আসিলেন। যে বছরটি চলিয়া গেল, তাহাতে রাজ মুকুট বহু হাত বদল হইল। লুই লি জিউনের মৃত্যু হওয়ায় ফিলিপ অগস্তাস ফ্রান্সের রাজা হইলেন। লিউসিয়াস পোপ আলেকজাণ্ডারের গদিতে বসিলেন। দ্বিতীয় আলেক্সিয়াস ম্যানুয়েল কমেনাসের স্থলে কনষ্টন্টিনোপলের সম্রাট হইলেন। এশিয়ার শাহী মহলেও বিপুল পরিবর্তন ঘটিল। আল-মুস্তাদী ইন্তেকাল করায় আন্-নাসির বাগদাদের খলিফা হইলেন। আর সায়ফুদ্দীন গাজীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা আয়েজউদ্দীন মসুলের সিংহাসন পাইলেন। ১১৮১ খৃস্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর সাংঘাতিক উদর বেদনায় সালিহ্ ইস্মাইলের নির্দোষ জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটিল।

মসুলের আতাবেগ ব্যতীত সালাহ্উদ্দীনের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার মত শক্তিশালী শাহ্জাদা জঙ্গীবংশে তখন আর কেহই ছিলেন না। তাহার জন্য সালিহ্ স্বীয় প্রধান কর্মচারীবর্গকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া গেলেন। সেই অনুসারে আয়েজউদ্দীন খুল্লতাত ভ্রাতার মৃত্যুর পরেই দ্রুতপদে আলেপ্পো অধিকারে ধাবিত হইলেন। বিগত রাজার অনুচরেরা তাঁহাকে আনন্দে বরণ করিয়া লইল। সিরিয়ায় অন্যান্য নগরও তাঁহার অধীনতা স্বীকারে ইচ্ছুক হইল। আর হামা প্রকাশ্যেই সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু আতাবেগ সন্ধি ভঙ্গ করিলেন না। অবশ্য ইহাতে ভয়েরও প্রভাব ছিল। এমনকি আলেপ্পো অধিকারই তাঁহার উদ্যমের পক্ষে অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুগপৎ দুইটি রাজধানী রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা সিঞ্জুরাধিপতি ইমাদুদ্দীনের সহিত নগর বিনিময়ে রাজী হইলেন। সেই অনুসারে ১১৮২ খৃস্টাব্দের ১৯শে মে ইমাদুদ্দীন আলেপ্পো প্রবেশ করিলেন।

এই সকল পরিবর্তনে সালাহ্উদ্দীন কোনই বাধা মনে করিলেন না। জীবনে কখনো তিনি কোন সন্ধি ভঙ্গ করেন নাই। আর এবারেও করিলেন না। সিরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেও উত্তর সীমান্তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। সালেহ্ ইসমাইলের মৃত্যুর পর আলেপ্পো দখলে আনা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে উহা ইমাদুদ্দীনের ন্যায় উচ্চাকাঙ্খী শাহ্জাদার হস্তগত হওয়ায় তাঁহার মতলব সিদ্ধির পথে এক অদৃষ্টপূর্ব বাধা উপস্থিত হইল। কিন্তু সন্ধি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিকারের কোনই উপায় ছিলনা। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ১১৮০ খৃস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

অবশ্য আর কেহই যখন সন্ধি রক্ষা করেন নাই, তখন সন্ধিভঙ্গ করিলেও সালাহ্উদ্দীনকে দোষ দেওয়া যাইত না। তাহাছাড়া, ফ্রাঙ্কেরা আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল। চেটিলনের রেজিনাণ্ড দীর্ঘকাল পরে কারামুক্ত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইলেন। তোরণের তৃতীয় হাম্ফ্রের কন্যা ও করকের উত্তরাধিকারিণী ষ্টেফেনিয়ার সহিত বিবাহের ফলে মরুসাগর তটস্থ দুর্গগুলি তাঁহার দখলে আসিল। ক্ষমতা হাতে পাইয়াই তিনি কাণ্ড-জ্ঞানহীনের ন্যায় উহার অপব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সন্ধির সময় অতীত না হইতেই তিনি অন্যায়ভাবে একদল শান্তশিষ্ট মুসলমান সওদাগরকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সালাহ্উদ্দীন এই অন্যায় জুলুম বরদাশ্ত করিতে পারিলেন না। দমিয়েতার নিকট দিয়া গমনকালে ১৫০০ তীর্থযাত্রীপূর্ণ একখানা খৃস্টান জাহাজ ডুবিয়া গেল। আর সালাহ্উদ্দীন ইহার যাত্রীদিগকে ধরিয়া নিয়া জামীন-রূপে আটক করিয়া রাখিলেন।

অবশেষে সন্ধির নির্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া গেল। ১১ই মে সালাহ্-উদ্দীন কায়রো ত্যাগ করিলেন। প্রধান কর্মচারী ও সভাসদেরা তাঁহাকে বিদায় দানের জন্য আবিসিনিয়া হ্রদের তীরে সমবেত হইলেন। কবিগণ তাঁহাদের তারিফ করিয়া কবিতা ও লেখকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সহসা একটা অসঙ্গত সুর সমস্ত মাধুর্য মাটি করিয়া দিল। প্রাচীন আরব কবির অনুকরণে কে যেন গাহিয়া উঠিল,

'ভুঞ্জিয়া কুসুমবাস নাও নজদের,
এই রাত পরে উহা দেখিবে না ফের।

এই বিরোধী সুর সালাহ্‌উদ্দীনের প্রাণে বড় বাজিল। তিনি ইহাকে নিতান্ত দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। আর তাঁহার হৃদয়ে যেন এক বিরাট বোঝা চাপিয়া গেল। এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ব্যর্থ হয় নাই। সালাহ্‌উদ্দীন আর কখনও কায়রো দেখিতে পান নাই।

যাহা হউক, খৃস্টানেরা তাঁহাকে বাধা দানের জন্য সীমান্তে সমবেত হইয়াছে শুনিয়া সালাহ্‌উদ্দীন মরুপথে সিনাই উপত্যকা দিয়া আয়লা বন্দরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি সির পর্বতের পাদদেশস্থ প্রস্তরময় প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে ফিরিলেন। মন্টরিয়েলের চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদ বিনা বাধায় তাঁহার হস্তে লুন্ঠিত হইল। খৃস্টানেরা তখন করকে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও তাহারা তাঁহাকে বাধা দানের জন্য এক অঙ্গুলীও নড়িলনা। তাহাদের জড়তায় সালাহ্‌উদ্দীন লাভবান হইলেন। তিনি মোয়াবের পথে জুন মাসের মধ্যভাগে দামেশ্‌কে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণাঞ্চলে বলডুইনের অনুপস্থিতির সুযোগে ফররুখ শাহ্ জর্ডন নদী অতিক্রম করিয়া গ্যালিলা উৎসন্ন, দেবুরিয়া লুন্ঠন, এমনকি খৃস্টান-দের অতি প্রয়োজনীয় গিরিদুর্গ হাবেশ জেলদেক অধিকার করিয়া ২০,০০০ গো-মহিষাদি ও ১০০০ বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভ্রাতুস্পুত্রের কৃতকার্যতায় প্রফুল্ল হইয়া সালাহ্‌উদ্দীন জুলাই মাসে তাঁহাকে পুনরায় প্যালেস্টাইন প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং জর্ডন নদী অতিক্রম করিয়া বায়সানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে ফ্রাঙ্কেরা শিবির ভাঙ্গিয়া বেলভয়ের রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। এই নবনির্মিত দুর্গে তাহাদের প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষিত ছিল। সালাহ্‌উদ্দীন ও তকিউদ্দীন ফররুখ শাহকে একদল ধনুর্ধর ও অশ্বারোহীসহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তারা পাহাড়ের পাদদেশে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। বেলিয়ান, রমলার বল্‌ডুইন ও অন্যান্য নাইট প্রাণপণে শত্রু দমন করিলেও পরিণামে মুসলমানেরাই জয়লাভ করিল। কিন্তু খৃস্টানদের তুলনায় তাহাদের লোকক্ষয় হইল অধিক।

আগস্ট মাসে সালাহ্‌উদ্দীন স্বয়ং বিকা নদীর অপর তীরে সৈন্য চালনা করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্-আদিল মিসর হইতে

নৌবাহিনী লইয়া বায়রুতের দিকে অগ্রসর হইলেন। নৌবহর উপস্থিত হইলে জল, স্থল উভয়দিক হইতে নগর আক্রান্ত হইল। কিন্তু তাহা দৃঢ় প্রাচীরে সুরক্ষিত থাকায় কোনই ক্ষতি হইল না।

এদিকে খৃস্টান বাহিনী অবরোধ উঠাইতে যাত্রা করিল। আর রাজা বল্‌ডুইন টায়ার ও একরে নৌবহর সজ্জিত করিতে লাগিলেন। অবরোধ যন্ত্র সংগে না থাকায় তাঁহার আগমনের পূর্বে মুসলমানদের পক্ষে শুধু অস্ত্রবলে নগর অধিকারের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সালাহ্‌উদ্দীন অবরোধ ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় ইরানের আমীর কুক্‌বারী তাঁহাকে জজিরা আক্রমণের জন্য দাওয়াত করিয়া পাঠাইলেন। বায়রুত অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব কম ছিলনা। সুতরাং সালাহ্‌উদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয়া সদলবলে আলেপ্পো যাত্রা করিলেন। তিনদিন পর্যন্ত নগর অবরোধের ভাণ করিয়া তিনি বিরায় ইউফ্রেতিস নদী উত্তীর্ণ হইলেন। সংবাদ পাইয়া নূরুদ্দীন ও কুক্‌-বারী তাঁহার সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিলেন। একে একে এডেসা, সরুজ, রাক্কা, কাকিসিয়া ও নিসিবন সালাহ্‌উদ্দীনের হস্তগত হইল। জজিরা দখল করিয়া তিনি মসুল যাত্রা করিলেন। আয়জুদ্দীন তাঁহাকে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর্মেনিয়া ও পারস্যের নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ মধ্যস্থতা করিতে আসিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। মসুল বা আলেপ্পো না পাইলে সালাহ্‌উদ্দীন কিছুতেই সন্ধি স্থাপনে রাজি হইলেন না।

১০ই নভেম্বর মসুল অবরোধ আরম্ভ হইল। কিন্তু একমাস চেষ্টা করিয়াও সালাহ্‌উদ্দীন উহা অধিকার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি চতুস্পার্শ্বস্থ নগরাবলী জয় করিয়া মসুল-রাজের শক্তি নাশে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। পনর দিন অবরোধের পর ৩০শে ডিসেম্বর সিঞ্জার দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। এ দিকে আর্মেনিয়ার শাহ্‌, মারিদিনের শাহ্‌জাদা, মসুলের আতাবেগ ও আলেপ্পোর রাজা তাঁহাকে বিধ্বস্ত করার জন্য হার্জেম প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহাদের নিকটবর্তী হইবা মাত্র তাঁহারা ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে উধাও হইয়া গেলেন (ফেব্রুয়ারী, ১১৮৩)।

অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে সালাহ্‌উদ্দীন চিরাচরিত নিয়মে নব-বিজিত রাজ্যে সামরিক জায়গীরদার নিযুক্ত

করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমিদ নগরের লৌহদ্বার, কৃষ্ণ-প্রস্তরের পুরু প্রাচীর ও তাইগ্রীস নদীর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার বাঁকের প্রতিরোধ সত্ত্বেও আট দিন অবরোধের পরে নগর তাঁহার দখলে আসিল। এই স্থানে বিপুল অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ যন্ত্র ও বহুমূল্য দ্রব্য-রাজী সালাহ্‌উদ্দীনের হস্তগত হইল। নগরের বিরাট কুতুব-খানা তিনি সুবিজ্ঞ কাজী আল্-ফাজিলকে দান করিলেন। কেবল নির্বাচিত পুস্তকগুলি লইয়া যাইতেই কাজী সাহেবের সত্তরটি উটের দরকার হইল। এদিকে আয়জুদ্দীন ফ্র্যাঙ্কদের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নি ও তরবারি যোগে সিরিয়া রাজ্য উৎসন্ন করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার সাহসী ও প্রভুভক্ত মিত্র নূরুদ্দীনকে আমিদ দুর্গ দান করিয়া পুনরায় ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে আয়নতাব তাঁহার হস্তগত হইল। ২১শে মে আলেপ্পোর সবুজ ময়দানে আবার তাঁহার তাঁবু পরিল। নূতন প্রজাবর্গের অপ্রিয় হওয়ায় আয়জুদ্দীন দীর্ঘকাল যাবত তাঁহাকে বাধা-দান করিতে পরিলেন না। সালাহ্‌উদ্দীনও নাছোড়বান্দা। কাজেই উভয়ের মধ্যে রাজ্য বিনিময়ের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, আয়জুদ্দীন সুলতানকে আলেপ্পো ছাড়িয়া দিবেন। আর প্রতিদানে তিনি তাঁহার জায়গীরদার হিসাবে রাক্কা, সেরাজু, নিসিবন প্রভৃতি নগরাবলীসহ সিঞ্জার রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। তদানুসারে ১২ই জুন সালাহ্‌উদ্দীনের হস্তে যথারীতি নগর অর্পিত হইল। পাঁচদিন পরে আয়জুদ্দীন সিঞ্জারে চলিয়া গেলেন। নাগরিকদের বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে সালাহ্‌উদ্দন তাঁহার অতি আকাঙ্খিত শহরে প্রবেশ করিলেন।

আলেপ্পো অধিকারের ফলে সালাহ্‌উদ্দীন মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠ নরপতিতে পরিণত হইলেন। পোপ, জার্মানীর সম্রাট ও ইউরোপের অন্যান্য প্রধান ভূপতির সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিতে লাগিল। কিন্তু এই বিশাল ভূভাগের অবিসংবাদী প্রভু হইতে হইলে তাঁহার আর একটা কাজ বাকী ছিল। এন্টিয়ক হইতে আস্কালন পর্যন্ত দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড, বিশেষতঃ পবিত্র জেরুজালেম নগরী তখনও খৃস্টানদের হাতে। বিপক্ষের এই ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার এশিয়া ও আফ্রিকা সাম্রাজ্যের সংযোগ সাধনের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে পর্যন্ত এই ব্যবধান দূরীভূত না হয়, যে পর্যন্ত পুণ্যভূমি আবার মুসলমানদের

দখলে না আসে, সে পর্যন্ত 'ইসলাম ও মুসলমানের সুলতানে'র পক্ষে কিছুতেই আরাম করার উপায় ছিল না।

প্যালেষ্টাইন আক্রমণ

দুই মাস আলেপ্পোয় থাকিয়া সালাহ্‌উদ্দীন ১১৮৩ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট দামেশ্‌কে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ জীবনের রাজধানী ও প্রধান কর্ম কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। অমিতবিক্রম ফররুখ শাহ্‌ জান্নাতবাসী হওয়ায় ফ্র্যাঙ্কেরা অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠে। বোস্রা, জোরা, এমন কি দামেশ্‌কের অদূরবর্তী দারায়্যা পর্যন্ত সমগ্র জনপদ তাহাদের হস্তে লুণ্ঠিত হয়। সোহেত দুর্গের জন্য সারাসিনরা অত্যন্ত গর্ব্বানুভব করিত, ফ্র্যাঙ্কেরা ইহাও কাড়িয়া লইল। চেটিলনের রেজিনাল্ড সকলের উপর টেক্কা দিলেন। তিনি একেবারে হজরতের পবিত্র কবর ও মক্কার কা'বা গৃহ ভূমিসাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার নৌবহর লোহিত সাগরতীরস্থ আয়ধাব বন্দর লুণ্ঠনে প্রেরিত হইল। আর বেদুইনদিগকে উৎকোচ দানে বাধ্য করিয়া জাহাজের অংশগুলি করক হইতে আকাবা উপসাগরে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং আয়লা অবরোধ করিলেন।

রেজিনাল্ডের জুলুমে চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। ষোলখানা আরব জাহাজ তাঁহার হস্তে ভস্মীভূত ও একখানা হজ্‌-যাত্রীর জাহাজ লুণ্ঠিত হইল। একদল নিরীহ পথিককে ধরিয়া নিয়া তিনি তাহাদের প্রত্যেকটি লোককে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইয়ামেন হইতে বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া দুইখানা জাহাজ মক্কা-মদীনা যাইতেছিল, সেগুলিও তাঁহার হাতে ধরা পড়িল। তাঁহার জুলুমবাজি বিশেষতঃ হজরতের দেহাস্থি বাহির করার চেষ্টার কথা শুনিয়া মুসলমানেরা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ মিসরীয় নৌ-বহর শীঘ্রই ফ্র্যাঙ্কদের অনুসরণ করিল। কাপ্তান লুলু আয়লার অবরোধ উঠাইয়া লোহিত সাগর তটস্থ অল্‌-হরা বন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফ্র্যাঙ্কেরা ত্বরিত গতিতে তীরে অবতরণ করিয়া পর্বতের দিকে পলায়ন করিল। লুলু তাঁহার নাবিকগণকে বেদুইনদের অশ্বে আরোহণ করাইয়া

তাহাদের অনুসরণ করিলেন। রবুগের গিরি-সঙ্কটে তিনি ফ্র্যাঙ্কদের সাক্ষাৎ পাইলেন। সঙ্কীর্ণ স্থানে আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের অধিকাংশ সৈন্য নিহত ও অবশিষ্ট বন্দী হইল। কিন্তু সমুদয় অপকার্যের নায়ক রেজিনাল্ড পালাইয়া গেলেন।

এই সকল দুষ্কার্যের জন্য খৃস্টানদিগকে শাস্তিদান করাই হইল সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর সালাহ্উদ্দীনের প্রথম কর্তব্য। সেইজন্য ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি সদলবলে জর্ডন নদী অতিক্রম করিলেন। খবর পাইয়া বায়সানের লোকেরা ভয়ে পালাইয়া গেল। পরিত্যক্ত নগর হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করিয়া সালাহ্উদ্দীন জেজ্রিল উপত্যকার পথে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আয়ন জেলুদের পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিলেন। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সৈন্যরা তেবুর ও নাজারেসের চতুর্দিকস্থ জনপদ ও ফর্বেলেত দখল করিল। খৃস্টানদের মূল বাহিনী তখন সাফুরিয়ায়। তাহাদের সহিত যোগদান করার জন্য একদল সৈন্য করক ত্যাগ করিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর ইহারাও মুসলমানদের হস্তে পরাজিত হইল। রাজা বল্ডুইন তখন পীড়িত। লুসিগ্নানের গদির উপর খৃস্টান বাহিনীর পরিচালনা-ভার ন্যস্ত। সাহায্যকারী সৈন্যদলের পরাজয়-বার্তা শ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভাঙ্গিয়া আল্-ফুলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সালাহ্উদ্দীনও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ দান করিলেন।

তের শত নাইট ও পনর হাজারের অধিক পদাতিক এই যুদ্ধে যোগদান করিল। ইতিপূর্বে প্যালেস্টাইনে কখনও এত অধিক ক্রুসেডারের সমাবেশ হয় নাই।* স্থানীয় খ্যাতনামা বীরগণ ব্যতীত লোভেনের ডিউক হেনরী, একুইটেনের রাফ ডি মেলেন প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আল্-ফুলার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তথাপি বহুক্ষণ পর্যন্ত জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। মুসলমানেরা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেও শত্রুদের ঘন-সন্নিবিষ্ট বর্শাধারী সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা আয়ন জুলুদে ও ফ্র্যাঙ্কেরা তুফানিয়ায় সরিয়া গিয়া পাঁচ দিন পর্যন্ত বসিয়া রহিল। পিসা, ভেনিস প্রভৃতি নগর হইতে বহু ইতালীয়

* "Never ... had Palestine seen so vast an army of Crusaders," —Archer and Ringsford. 262.

বণিক আসিয়া প্রত্যহ ক্রুসেডারদের দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সারাসিনেরা পাহাড় অধিকার করিয়া ফেলিল। তাহাদের সতর্ক চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া খাদ্য আমদানী অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ফলে খৃস্টান শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সালাহ্‌উদ্দীন তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইলেন। কিন্তু তাহারা যুদ্ধ না করিয়া শেষ পর্যন্ত সাফুরিয়ায় পালাইয়া গেল। সুলতানের ধনুর্দ্ধরেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিল।

এবার সালাহ্‌উদ্দীন রেজিনাল্ডের সহিত হিসাব নিকাশ করিবার জন্য করকের দিকে অগ্রসর হইলেন। আল্-আদিল মিসর বাহিনী লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজকীয় সৈন্যদল রেজিনাল্ডের সাহায্যে আসিতেছে জানিতে পারিয়া সালাহ্‌উদ্দীন ৪ঠা ডিসেম্বর দামেশ্‌কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী গ্রীষ্মকালে (আগষ্ট ১৩,১১৮৪) তিনি আবার করক অধিকারের প্রয়াস পাইলেন। নাগরিকেরা তখন রাজার বৈমাত্রেয় ভগিনী ইসাবেলার সহিত তোরণের চতুর্থ হাম্ফের বিবাহ উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদে মত্ত। এমন সময় সালাহ্‌উদ্দীনের অবরোধের ফলে এই উৎসব অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হইল। মুসলমানেরা বলপূর্বক নগরে প্রবেশ করিল। রেজিনাল্ড অতিকষ্টে, দুর্গ-মধ্যে পালাইয়া গেলেন। জনৈক নাইট প্রাচীনকালের হোরেসিউর ন্যায় অসীম সাহসে সেতু রক্ষা না করিলে সারাসিনেরা অবশ্যই উহা কাটিয়া ফেলিত। সঙ্গে সঙ্গে রেজিনাল্ডও মরিতেন, দুর্গও তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যাইত। ধূর্ত নাইট দুর্গে গিয়া সালাহ্‌উদ্দীনকে মদ্যমাংস প্রেরণ করিলেন। এতদ্বারা যেন তাঁহাকে বিবাহোৎসবের অংশী করা হইল।* সদাসয় সুলতান বর-কনের বাসর ঘর আক্রমণ না করার জন্য তৎক্ষণাৎ সৈন্যদলে কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন।

শহর ও উপনগর সালাহ্‌উদ্দীনের দখলে আসিলেও দুর্গ অবিজিত রহিল। তিনি পরিখা ভরাট করিয়া অবরোধ যন্ত্রের সাহায্যে দুর্গ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রক্ষীসৈন্যেরা ভগ্নস্থান অধিকার করিয়া রহিল। সেপ্টেম্বরে একদল মুক্তি সেনা আসিয়া তাহাদিগকে গোপনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিল। তাহারা অতর্কিত আক্রমণে

অবরোধকারীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছুতেই তাহাদিগকে সমুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে না পারিয়া সালাহ্উদ্দীন সামারিয়া ও দেবুরিয়া হইতে প্রচুর মালে গাণীমাত লাভ করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর দামেশ্কে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কিছু কাল যুদ্ধ বন্ধ রহিল। শরৎকালে একটি বালকের শিরে রাজ-মুকুট পরাইয়া বল্ড্ইন দেহত্যাগ করিলেন। ত্রিপোলিসের রেমণ্ড রাজা পঞ্চম বল্ড্ইনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। অধিকাংশ নেতাই শান্তি স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করায় চারি বৎসরের জন্য উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। সালাহ্উদ্দীন রেমণ্ডের সিংহাসন লাভের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। বিনিময়ে কাউন্ট তাঁহার সমস্ত মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এমনকি ১১৮৫ খৃস্টাব্দে দামেশ্কে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি সিরিয়ায় প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে কুন্ঠিত হইলেন না। কিন্তু রেমণ্ড ও সালাহ্উদ্দীনের মধ্যে যতই সদ্ভাব থাকুক না কেন, এই ফ্রাঙ্ক-সারাসিন সন্ধি ছিল প্রকৃত-পক্ষে শ্রান্ত সৈনিকের নিদ্রার ন্যায়। ধর্মাচার্য হেরাক্লিয়াস তখন নূতন সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইউরোপময় ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন। আর চেভিয়ট হইতে পিরানিজ পর্বতমালা পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ইংরেজ নাইটেরা ক্রুশ গ্রহণ করিতেছিলেন। অপরদিকে টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায় ক্রুসেডে যোগদানের জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। কাজেই এই সন্ধি-পত্র যে অনতিকাল পরেই বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

মসুল অভিযান

সালাহ্উদ্দীন অবসর কালের অধিকাংশই সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানে ব্যয় করিলেন। কিন্তু বেশী দিন শান্তিতে থাকা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ফ্র্যাঙ্ক-সারাসিন সন্ধির কিছুকাল পরেই জজিরার রাজা সিঞ্জার শাহ্ ও ইরবিলের আমীর সালাহ্উদ্দীনের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের দলত্যাগে রুষ্ট হইয়া মসুলের আতাবেগ ইরবিলাধিপতিকে শাস্তি দানে সচেষ্ট হইলেন। স্বীয় করদ রাজার কাতর আবেদনে সালাহ্উদ্দীনকে আবার যুদ্ধে নামিতে হইল। ১১৮৫ খৃস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বিরায় ইউফ্রেটিজ নদী উত্তীর্ণ হইলে কুর্কবারী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। রসূল আয়নে উপস্থিত হইয়া সালাহ্-উদ্দীন শুনিতে পাইলেন, পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজা মসুলের আতাবেককে রক্ষা করার জন্য সমবেত হইয়াছেন। এই ভীতি-প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া তিনি দুনিসিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে মারিদিনের সৈন্যেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইল। অবশেষে জুন মাসে মসুলের সম্মুখে আবার তাঁহার তাঁবু পড়িল। আতাবেক শান্তির প্রস্তাব লইয়া বৃথাই তাঁহার মাতা ও অন্যান্য মহিলাকে সুলতানের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোনই ত্রুটি হইল না। কিন্তু তাঁহারা কেহই কোন প্রতিশ্রুতি পাইলেন না এবং সালাহ্উদ্দীনের মনোভাব পরিবর্তিত হইল না।

মসুলবাসীরা নিরাশ হইলেও প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল। ভাগ্য তাহাদের অনুকূল থাকায় সালাহ্উদ্দীনের অবরোধও পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ হইল। এই সময় আর্মেনিয়ায় গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় তিনি অবরোধ উঠাইয়া সৈন্যগণকে দিয়ার বকরের শীতলতর স্থানে লইয়া গেলেন। মায়্যাফারিকিন দখল করিয়া আগষ্টের শেষে তিনি পুনরায় মসুল অবরোধ আরম্ভ করিলেন। তখন বর্ষাকাল। কি সৈন্য, কি সেনাপতি কেহই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া বরদাশ্ত্ করিতে পারিল না। সালাহ্উদ্দীন নিজেও ভীষণভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অশ্বারোহণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেল। প্রায়

মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে কুক্‌বারীর দুর্গে স্থানান্তরিত করা হইল। আল্‌-আদিল মিসর হইতে রাজ বৈদ্য লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তথাপি বহুদিন পর্যন্ত তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়িয়া রহিলেন। এমন কি একবার তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াও গুজব উঠিল। এই সংবাদে তাঁহার বহু আত্মীয় ভাগ্য পরীক্ষার জন্য চেল্টিত হইলেন। অবশ্য বাঁচিবেন বলিয়া সালাহ্‌উদ্দীনের নিজেরও বিশেষ ভরসা ছিল না। কাজেই তিনি শাহ্‌জাদাদের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখার জন্য সেনাপতিদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। কিন্তু যতদিন যাহার হায়াৎ, ততদিন তাহার মৃত্যু নাই। নৈরাশ্য সত্ত্বেও শত্রু ও লোভী আত্মীয়দের মুখে ছাই দিয়া অবশেষে সালাহ্‌উদ্দীন ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ফেব্রুয়ারীর (১১৮৬ খৃঃ) শেষভাগে তিনি আতাবেকের দূতদের সহিত কথাবার্তা বলিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার শরীর এত দুর্বল ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে কোথাও যুদ্ধযাত্রা করা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। সম্ভবতঃ বিপদ ও রোগযন্ত্রণায়ও তাঁহার মন অনেকটা নরম হইয়া পরিয়াছিল। কাজেই এবার তিনি শান্তির প্রস্তাবে ততটা উদাসীন্য দেখাইলেন না। ৩রা মার্চ আতাবেকের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হইল। শর্তানুসারে তিনি জাব নদীর অপর পার্শ্বস্থ শাহরজুরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমগ্র জনপদ নিজে গ্রহণ করিলেন। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিজ নদীর মধ্যবর্তী যে ভূখণ্ড তখন আয়জুদ্দীনের অধিকারে ছিল, খুৎবা ও মুদ্রায় সুলতানের পূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করায় উহা তাঁহার দখলে রহিল। এই সন্ধির ফলে সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্তানের কিয়দংশ সালাহ্‌উদ্দীনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। তাঁহার করদ রাজাদের তালিকায় মসুলের আতাবেকের নাম উঠিল।

মসুলের সন্ধির পর সালাহ্‌উদ্দীন মন্থর গতিতে দামেশ্‌কে চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি বিশ্রাম গ্রহণার্থে এমেশায় প্রবেশ করিলেন এবং এই নগর শের্কুর পুত্র নাসিরুদ্দীনকে জায়গীর দেন। কেবল তাহাই নহে, সদাশয় সুলতান নিজ কন্যার সহিত খুল্লতাত ভ্রাতার বিবাহ দিয়া আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ়তর করেন। কিন্তু তাঁহার অসুখের সময় এই নেমকহারাম সিরিয়ায় সিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অবশ্য কৃতঘ্নতার প্রতিফলের জন্য তাঁহাকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ৪ঠা মার্চ ঈদ-উল-আজহার রাত্রে আকণ্ঠ

মদ্য পানের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সালাহ্‌উদ্দীন বিগত আমিরের বার বৎসর বয়স্ক পুত্রকে পিতার পদে বহাল রাখিয়া আলেপ্পো হইয়া এপ্রিল মাসে দামেশ্‌কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমাধি হইতে উত্থিত দ্বিতীয় লাজারসের ন্যায় নাগরিকেরা বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল।

হিত্তিনের যুদ্ধ

অবশেষে খৃস্টানদের মহাসঙ্কটকাল ঘনাইয়া আসিল। এতদিনে সালাহ্‌উদ্দীন তাহাদিগকে জোরেশোরে আক্রমণ করার মত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিজ নদী-বিধৌত প্রদেশে তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হইল। অবশ্য উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণে বাধা দানের জন্য সেখানে একদল সৈন্য না রাখিয়া তিনি পালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। মুসলমান শত্রুরা মিত্রে পরিণত হওয়ায় এখন খৃস্টান রাজ্য আক্রমণের পক্ষে তাঁহার আর কোন বাধা রহিল না। তাঁহার শক্তিও পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইল। সিরিয়া ও মিসর ব্যতীত কুর্দিস্তান ও মেসোপটেমিয়া হইতেও তিনি এখন বিপুল সাহায্য পাইতে পারিতেন। এই অতিরিক্ত শক্তিব্যতীত তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপ হইতে আনীত নবীন ও সবল সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়া কিছুতেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

জিহাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সালাহ্‌উদ্দীন দীর্ঘকাল হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু চিরাচরিত নিয়মে রেজিনাল্ডই তাঁহার উপস্থিত ক্রোধের কারণ হইলেন। কারণ, মক্কা হইতে সিরিয়া গমনকালে নিরীহ বণিক ও তীর্থযাত্রীদল লুন্ঠন করা তাঁহার পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১১৭৯ খৃস্টাব্দ শান্তির সময়। একদল যাত্রী নিশ্চিন্ত মনে করকের প্রাচীর-নিম্নে শিবির স্থাপন করিল। সহসা তিনি তাহাদের উপর আপতিত হইয়া দুই লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি সহ যাত্রীগণের সকলকে বন্দী করিলেন। এমনকি তাহাদের পশু-পক্ষীগুলিও তাহা হইতে বাদ পড়িল না। ইহাতে বলডুইন সন্ধির প্রকাশ্য বরখেলাফ' দেখিলেন। আর তিনি সন্ধির এই প্রকাশ্য বর্‌-খেলাফের প্রতিবাদ করিয়া রথাই দূত পাঠাইলেন। কারণ রেজিনাল্ড তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অপর দিকে ১১৮২ খৃস্টাব্দে সন্ধির সময় আর একদল যাত্রী তাঁহার হস্তে এইভাবে লুন্ঠিত ও বন্দী হইল।

১১৮৬ খৃস্টাব্দও শান্তির সময়। যাত্রীরা বিপদাশঙ্কা না করিয়া সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। এই সময় সুলতানের

এক ভগিনীও একদল শান্তশিষ্ট বণিকের তত্ত্বাবধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু, রেজিনাল্ড তাহাদিগকেও ছাড়িলেন না। বরং তাহাদের উপর আপতিত হইয়া বহুমূল্যবান দ্রব্য কাড়িয়া লইলেন। বণিকগণ এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করিলে করকাধিপতি উত্তর দিলেন, "তোমরা ত মহাম্মদে (দঃ) বিশ্বাস কর, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন না কেন?" এই সকল অমার্জ্জিত কথা সুলতানের কর্ণগোচর হইলে তিনি রেজিনাল্ডকে নিধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। আর এই ভাবে যাত্রীদল লুণ্ঠনই জেরুজালেম রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ। *

সালাহ্‌উদ্দীন বারংবার করক অধিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। এবার তিনি অর্ধ উপায় অবলম্বন না করিয়া সমগ্র খৃস্টান রাজ্যের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তদনুসারে ১১৮৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া এক ফর্‌মান জারি করিলেন। তাঁহার দূতেরা সৈন্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়া, জাজিরা, মেসোপটেমিয়া, দিয়ারবকর ও মিসরের নগরাবলীতে ছুটিয়া গেল। মক্কা হইতে প্রত্যাগত হাজীগণকে রক্ষা করিবার জন্য সুলতান স্বয়ং এপ্রিল মাসে করকের নিকটে হাজির হইলেন। তাঁহারা নিরাপদে প্রস্থান করিলে তিনি শত্রুরাজ্য উৎসন্ন করিয়া ২৮শে মে আশ্‌তারায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

একযোগে সালাহ্‌উদ্দীনকে বাধা দান করিবার মত অবস্থা তখন ফ্র্যাঙ্কদের ছিল না। সেপ্টেম্বরে পঞ্চম বল্‌ডুইনের মৃত্যু হইলে রেজিনাল্ড, জোসেলিন প্রভৃতি একদল নেতা আমালরিকের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিবিলাকে সিংহাসন দান করেন। তিনি আবার তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী গাঈ ডি লুসিগ্‌নানের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দেন। ইনি এত কুখ্যাতি লাভ করেন যে, এই সংবাদ শুনিয়া ইঁহার ভ্রাতা জেফ্রী বলিয়া উঠেন, 'যাহারা তাহাকে রাজত্ব দিয়াছে, আমাকে পাইলে তাহারা অবশ্যই দেবতা করিত।" * কাজেই রেমণ্ড ও রমলার বলডুইন এই রীতিবিরুদ্ধ রাজাভিষেক অস্বীকার করিয়া সিবিলার কনিষ্ঠা ভগিনী ইসাবেলার স্বামী তোরণের চতুর্থ হাম্ফ্রের

** His reluctance to hold his hand whether in peace or war was to lead ... to the ruin of the Kingdom."—Archer & Kingsford, 260.*

**Gibbon, VI, 371.*

পক্ষ সমর্থন করিলেন। হাম্ফ্রে গাঈর বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহারা নূতন রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকালে ঐক্য স্থাপনের জন্য তদ্‌বির আরম্ভ হইল। ইবেলিনের বেলিয়ান এবং টেম্পলার ও হস্পিটালারদের অধ্যক্ষদ্বয় রুস্ট কাউন্টকে তুষ্ট করিবার জন্য তাইবেরিয়াসে প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে ফাবায় তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইল। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আল্‌-আফজাল সেদিন রেমণ্ডের রাজ্য শিকার করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়াই অধ্যক্ষদ্বয় ১৩৫ জন নাইট ও ৪০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করার জন্য বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন। ব্রেসনের উৎসের নিকটে দুই দলে সাক্ষাৎ হইল। পদাতিকেরা তখনও পশ্চাতে। উগ্র-মস্তিষ্ক যোদ্ধা-সন্ন্যাসীরা তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল। ফলে হস্পিটালারদের অধ্যক্ষের মস্তক কর্তিত, অধ্যক্ষ ও অপর দুইটি লোক ব্যতীত টেম্পলারদের সমস্ত লোক নিহত এবং ৪০ জন নাইট বন্দী হইলেন।

এই দুর্ঘটনার জন্য খৃস্টানেরা রেমণ্ডকে দায়ী করিল। কাজেই পাপ ক্ষলণের জন্য তিনি গাঈর সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরামর্শের পর সাফুরিয়ার উৎস-শ্রেণীর নিকটে সৈন্য সমাবেশের জন্য চতুর্দিকে দূত ছুটিল। টমাস বেকেটকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইংরেজ রাজ হেনরীর প্রেরিত অর্থে ইংল্যাণ্ডেরপক্ষে সৈন্য সংগ্রহ চলিল। ১২০০ নাইট, ১৮০০০ পদাতিক ও সারাসিন প্রথায় সজ্জিত কয়েক হাজার অশ্বারোহী, সর্বশুদ্ধ অর্ধলক্ষ লোক ক্রুশ-পতাকার নিম্নে সমবেত হইল। এদিকে মসুল ও মারিদিন হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া জুটায় সালাহ্‌উদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যাই বার হাজারে উঠিল। ইহাদের সকলেই ছিলেন জায়গীরদার বা বৃত্তিধারী সম্ভ্রান্ত লোক। সালাহ্‌উদ্দিন সৈন্যগণকে অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং কেন্দ্রভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাকিউদ্দীন ও কুকবারীর উপর উভয় পার্শ্বের পরিচালনা-ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপে সৈন্যদল গঠন করিয়া ২৬শে জুন শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর তিনি ফ্র্যাঙ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। জর্ডন অতিক্রমের পর সাফুরিয়ার দশ মাইল পূর্বে হিত্তির গ্রামের নিকটে তাঁহার তাঁবু পড়িল। নগর রক্ষার ভার তখন

রেমাণ্ডের স্ত্রীর উপর। তাঁহার আবেদনে রাজা গাঈ তাইবেরিয়াস যাত্রা করিলে সালাহ্‌উদ্দীন অবরোধের জন্য ক্ষুদ্র একদল সৈন্য রাখিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হিত্তিনের চতুর্দিকস্থ ভূভাগ জলপাই ও অন্যান্য ফলবান বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। নিম্নস্থ উপত্যকা ও তাইবেরিয়াসের নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর পানি পাওয়া যাইত। কিন্তু এক মাইল দক্ষিণে 'হিত্তিনের শৃঙ্গ' নামক প্রস্তরময় ক্ষুদ্র পাহাড়ও উহার পশ্চাতে ১৭০০ ফুট নিম্নে গ্যালিলি হ্রদ অবস্থিত থাকায় পরাজিত হইলে ক্রম-নিম্নস্থানে নিক্ষিপ্ত ও হ্রদের দিকে বিতাড়িত হইয়া মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। উভয় শিবিরের মধ্যে একটি প্রস্রবণ বা স্রোতস্বতীও ছিল না। কিন্তু ঝোপ ও শৈল-শৃঙ্গ পূর্ণ সৌর-কর-দগ্ধ এক বিশাল প্রান্তর ছিল। অথচ ফাবা ও বেলভয়েরে খৃস্টানদের দুইটি বহিঃসেনানিবাস ছিল। প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকায় তাহারা জেজ্‌রিল উপত্যকা দিয়া নির্বিঘ্নে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত। একদল সৈন্য পাঠাইয়া জর্ডন নদীর সেতুগুলি ধ্বংস করিয়া মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন পথ বন্ধ করাও তাহাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল না। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীনের পতাকা-তলে অসংখ্য সৈন্য সমবেত হইয়াছে শুনিয়া তাহারা একটি সৈন্যকেও স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে সাহসী হইল না। তাহাদের শিবিরের এক মাইল দক্ষিণেই সাফুরিয়ার প্রস্রবণ। চতুর্দিকস্থ ভূভাগ গ্রামপূর্ণ ছিল বলিয়া খাদ্য সংগ্রহেরও কোন অসুবিধা ছিল না। সুতরাং স্থান ত্যাগ না করিয়া সালাহ্‌উদ্দীনের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকিলে যুদ্ধের ফল হয়ত অন্যরূপ হইত। কিন্তু রেমণ্ডের সাবধান-বাণী উপেক্ষা করিয়া রাজা গাঈ যখন টেম্পলারের অধ্যক্ষের জেদের বশবর্তী হইয়া পানি হীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া সৈন্যগণকে তাইবেরিয়াস যাত্রার আদেশ দিলেন, তখনই সমস্ত সুবিধা নষ্ট হইয়া গেল।

৩রা জুলাই শুক্রবার খৃস্টান বাহিনী সাফুরিয়ার শিবির ভাঙ্গিয়া তাইবেরিয়াস যাত্রা করিল। তাহারা রওয়ানা হইতে না হইতেই খণ্ডযুদ্ধকারী মুসলমানেরা তাহাদের উপর আপতিত হইল। ইবেলিনের বেলিয়ান সৈন্যদলের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁহার বহু নাইট সারাসিনদের হস্তে নিহত হইল। প্রখর সূর্য-কিরণে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ উত্তপ্ত হইয়া হতভাগ্য ফ্রাঙ্কদিগকে অর্দ্ধ-দগ্ধ করিয়া ফেলিল। কোথাও এক বিন্দু

পানি পাওয়ার উপায় ছিল না। সমগ্র বাহিনী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অথচ সন্ধ্যাকালেও তাইবেরিয়াসের অর্ধেক পথ বাকী রহিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া রাজা গাঈ সৈন্যগণকে সশস্ত্র অবস্থায় রাত্রি যাপনের আদেশ দান করিলেন। এই রাত খৃস্টানদের কার্‌বালা। চতুর্দিকে শুধু পানির জন্য চীৎকার উঠিতে লাগিল। তৃষ্ণায় মানুষ ও অশ্বাদির প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার উপক্রম হইল। সারাসিনেরা শুষ্ক কাষ্ঠ ও লতাপাতা জড় করিয়া তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। ধুয়ায় ফ্র্যাঙ্কদের দুর্দশা আরও বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

অবশেষে ৪ঠা জুলাই শনিবারের প্রাতঃকাল দেখা দিল। নাইটেরা প্রত্যূষেই অশ্বারোহণ করিলেন। কিন্তু শ্রান্ত পদাতিকেরা তৃষ্ণায় মুখ-মলিন করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে কুপগুলি সারাসিনদের অধিকারে থাকায় তাহারা সবল ও সতেজ ছিল। নিজেদের বিপদজনক অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিলেও খৃস্টানদের শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের উৎকণ্ঠা অনেকটা হ্রাস পাইল। হিত্তিনের দুইমাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে লুবিয়া গ্রামের নিকটে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। যে সকল সারাসিন কাফার সেবতের পাহাড় দখল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা রাজা গাঈকে তাইবেরিয়াসের রাস্তা হইতে তাড়াইয়া দিল। এবার তিনি ওয়াদী হাম্মামের কূপশ্রেণীর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করিলেন। মুসলমানেরা কিছুক্ষণ দূরে সরিয়া রহিল। উদীয়মান সূর্য-কিরণে খৃস্টানদের চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া আসিলে শরাঘাতে তাহাদের বহু সৈন্যকে অশ্বহীন করিয়া তাহারা একযোগে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। শ্রান্ত হইলেও খৃস্টানেরা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিল। কিন্তু কতক্ষণ? তৃষ্ণায় উন্মত্ত, মার্তণ্ড-তাপে দগ্ধ এবং ধূম ও অগ্নি-শিখায় অন্ধপ্রায় পদাতিকেরা অচিরে ব্যূহ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা পানির জন্য উন্মাদের ন্যায় হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে সারাসিনেরা তাহাদের উপর আপতিত হইয়া কিয়দংশকে পাহাড়ের নিম্নে নিক্ষেপ করিল, আর অবশিষ্ট লোক নিহত বা বন্দী হইল। কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুসলমানদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল।

পশ্চাৎভাগে হস্পিটালার ও টেম্পালার নাইটেরা এবং মধ্যভাগে রাজা গাঈ নিজেও হতবুদ্ধি ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। অথাপি

রেমণ্ড শেষ চেষ্টা করার জন্য রাজাজ্ঞা পাইলেন। কিন্তু তাকিউদ্দীন তদপেক্ষা অনেক বেশী ধূর্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে রেমণ্ডের নাইটেরাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া রাজা ১৫০ নাইট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সহ সর্বশেষ বার হিত্তিনের শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বর্তুলের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। ফ্রাঙ্কেরা দুইবার শত্রুদিগকে হটাইয়া দিল। কিন্তু তাহারা পরক্ষণেই পাহাড়ের উপর বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইল। অবশেষে মুসলমানেরা রাজ শিবির উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। একরের বিশপের হাতে ক্রুশ-পতাকা ছিল। কিন্তু তিনি বর্ম পরিহিত থাকা সত্ত্বেও নিহত হইলেন। তৃষ্ণার্ত নাইটেরা নিরাশ হইয়া তৃণের উপর দেহ বিস্তৃত করিয়া দিল। মুহূর্ত মধ্যে তুর্কীরা তাহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিল। হাম্ফ্রে, জোসেলিন, রেজিনাল্ড, রাজা, রাজ-ভ্রাতা এবং টেম্পলার ও হস্পিটালারদের সর্দার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক বন্দী হইলেন। রেমণ্ড, বেলিয়ান ও সিডনের প্রিন্স পলাইয়া গেলেন। সর্বশুদ্ধ ৩০০০০ খৃস্টান দেহত্যাগ করিল। আর দীর্ঘকাল পরেও তাহাদের কঙ্কালস্তূপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

রেজিনাল্ডকে বধ করাইয়া সালাহ্‌উদ্দীন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্বৃত্ত বলিয়া টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের ২০০ নাইট ফাঁসী-কাষ্ঠে আত্মহুতি হইল। সুলতান রাজাকে নিজের নিকটে বসাইয়া শরবৎ পান করাইলেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বন্দীর প্রতিও তিনি যথেষ্ট সদাশয়তা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে দামেশ্‌কে পাঠাইয়া দিলেন।

প্যালেষ্টাইন জয়

মুসলমানেরা খোদাকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দোৎসবের মধ্যে বিনিদ্র রজনী যাপন করিল। তাহাদের উল্লাসের যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ হিত্তিনের যুদ্ধ গোটা প্যালেষ্টাইন তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। এই পরাজয়ের ফলে জেরুজালেম রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল। রাজা ও প্রায় সমুদয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সালাহ্উদ্দীনের হাতে বন্দী হন, ধ্বংসাবশিষ্ট ক্রুসেডারকে একত্র করিবার মত কোন উপযুক্ত লোক ছিল না বলিলেই চলে। হিত্তিনের শৃঙ্গে তাহাদের যে অমূল্য রত্ন নষ্ট হয়, ৭০০ বৎসরের মধ্যে তাহারা আর তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই।

হিত্তিনের যুদ্ধের পর তাইবেরিয়াস দুর্গ হস্তগত করাই হইল সালাহ্উদ্দীনের প্রথম কাজ। ৫ই জুলাই তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা ও সাহায্য লাভের আশায় বঞ্চিতা হইয়া বীর-নারী এসিভার পক্ষে আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সদাশয় সুলতান তাঁহাকে তাঁহার সন্তান-সন্ততি ও অনুচরবর্গ সহ নিরাপদে স্থানান্তর গমনের অনুমতি দিলেন। একদিন বিশ্রামের পর মুসলমানেরা রাজ্যাধিকারের জন্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদিগকে কোথাও বিশেষ বাধা পাইতে হইল না। তাহারা কোন শহরের নিকট হাজির হইলেই জেরিকোর ন্যায় উহার দেওয়াল খসিয়া পড়িত, সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষী সৈন্যেরা আত্ম-সমর্পণ করিত। কেবল কয়েকটি দুর্গ তাহাদের অবরোধের প্রতিরোধ করিল। কিন্তু উহাদের একটিও এক সপ্তাহের অধিক আত্ম-রক্ষা করিতে পারিল না। খৃস্টানদের নেতৃবৃন্দ নিহত বা বন্দী সৈন্যেরা হত, আহত বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। অধিবাসীরা প্রধানতঃ মুসলমান কৃষক ও বণিক। তাঁহারা সালাহ্উদ্দীনের দয়া ও ন্যায়-বিচারে মুগ্ধ ছিলেন। প্রত্যেক নগরেই বহু মুসলমান বন্দী তাঁহার হাতে মুক্তি লাভের আশায় দিন গণিতেছিল। খৃস্টান প্রভুরা বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়কে ইস্লামের ন্যায়ই ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনপ্রিয়তা অপেক্ষা সদাশয়

সুলতানের নিকট এমন কি ইহাদেরও ভয়ের কারণ কম ছিল। *অধিবাসীরা তাঁহার সমর্থন করায় এবং দূর-দূরান্তরে অবস্থিত কয়েকটি রক্ষী সৈন্যদল ব্যতীত তাঁহাকে বাধাদানের কোন লোক না থাকায় প্যালেস্টাইনে সালাহ্‌উদ্দীনের বিজয়-গতি যে কোথাও বিশেষভাবে প্রতিহত হয় নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

মুসলমানেরা সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের অনুসরণ না করিলে খৃস্টানেরা হয়ত একত্র হইতে পারিত। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন তাহাদিগকে সে অবসর দিলেন না। যুদ্ধের মাত্র চারি দিন পরে (৮ই জুলাই) তিনি একরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নগরের মস্‌জিদ তিন পুরুষ ধরিয়া গির্জ্জারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। তিনি পুনরায় উহাকে মস্‌জিদে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে জুম্মা নামাজ আদায় করিলেন। ক্রুসেডারদের আগমনের পর প্যালেস্টাইনের সমুদ্র-তটে ইহাই সর্বপ্রথম মুস্‌লিম উপাসনা। একমাত্র এখানেই ৪০০০ মুসলমান বন্দী মুক্তিলাভ করিল। নগরের ধনাগার ও অস্ত্রশস্ত্রে সালাহ্‌উদ্দীনের বল বৃদ্ধি পাইল। সৈন্যেরা নানাদলে বিভক্ত হইয়া রাজ্যাধিকারের জন্য চতুর্দ্দিকে আর আল্-আদিল মিসর-বাহিনী লইয়া প্যালেস্টাইনে আসিতে আদিষ্ট হইলেন। কয়েকটি সেনাদল ফাবা (আল্-ফুলা), নাজারেস ও সাফুরিয়া অধিকার করিল। কোন কোন দল হায়ফা ও সিজারিয়ায় (কায়সারিয়া) প্রবেশ করিল। আবার কোনটি বা সেবাস্তে ও নেবলুস জয় করিল। আল্-আদিল জাফ্‌ফা ও মিরাবেল দখলে আনিলেন। সালাহ্‌উদ্দীন স্বয়ং তোরণ অবরোধ করিলেন। ছয় দিন পরে দুর্গ-শিরে তাঁহার পতাকা উত্তোলিত হইল। অতঃপর সমুদ্র-তটে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আট দিন অবরোধের পর বৈরুত ও জুবিল অধিকার করিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রক্ষী সৈন্য ও অধিবাসীরা তাঁহার নিকট সম্মানজনক শর্ত পাইল। সর্বত্রই লোকে বুঝিতে পারিল, এই মুসলমান নরপতির বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

সফেদ, হুনিন, বেলফোট্, বেলভয়ের, টায়ার, আস্কালন, জেরুজালেম প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ ও নগর ব্যতীত সমগ্র পালেস্টাইন আগস্টের

* "Even the scattered Christian sects had less to fear from the generous Sultan than from the rapacity and tyranny of their Christian masters,"...Lane-poole, 218.

প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এইরূপে সালাহ্উদ্দীনের হস্তগত হইল। টায়ার এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে রক্ষা পাইল। রেমণ্ড ত্রিপোলিসে গিয়া ক্ষোভে-দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার গদি এন্টিয়কের প্রিন্সের হস্তগত হয়। তিনি টায়ারের ক্ষুদ্র রক্ষীদলের বল-বৃদ্ধি করেন নাই। কাজেই প্রাচীরের দৃঢ়তায় ভীত না হইয়া সালাহ্উদ্দীন একরের পর সটান টায়ার আক্রমণ করিলে রক্ষীসৈন্যেরা অবিলম্বে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। নাগরিকেরা এমন কি এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ ছিল। সামান্য খাদ্য ও কয়েকটি লোক ব্যাতীত দুর্গে আর কিছুই ছিল না। কাজেই কিল্লাদার ও সিডনের রেজিনাল্ড তাঁহাকে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। পরদিন দুর্গ-শিরে উড়াইবার জন্য সুলতান এমন কি দুইখানা পতাকা পর্যন্ত পাঠাইয়া দিলেন। এমন সময় এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনায় কেবল সেই টায়ারই রক্ষা পাইল এমন নহে, সিরিয়া উপকূলের ভবিষ্যৎ ভাগ্য পর্যন্ত বদ্লিয়া গেল।

মন্টফের্রাতের মার্কোস কনরাড ইতালী ও বাইজান্টাইনের যুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কনষ্টান্টিনোপলের এক হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিস্ট থাকায় সেখানে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। প্রাণের দায়ে তিনি কয়েক জন অনুচর সহ তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে এক জাহাজে উঠিয়া ইউরোপ হইতে পলায়ন করেন। টায়ারের নিকট আসিয়া উহা তখনও খৃস্টানদের হাতে রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। নাগরিকেরা তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সেনাপতির পদে বরণ করিল। বেগতিক দেখিয়া কিল্লাদার ও রেজিনাল্ড রাত্রিকালে ত্রিপোলিসে পালাইয়া গেলেন।

কন্রাডের নিকট উৎসাহ পাইয়া রক্ষী সৈন্যরা আত্ম-সমর্পণের ধারণা বিসর্জন দিয়া প্রাণপণে দুর্গ-রক্ষায় সচেষ্ট হইল। সালাহ্-উদ্দীন বুঝিলেন, সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি শেষ চেষ্টা করিলেন। মন্ট্ফের্রাতের বৃদ্ধ মার্কোসকে দামেশ্কের কারাগার হইতে সেখানে আনাইয়া দুর্গের বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্তি দানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কনরাড্ উত্তর দিলেন, "বৃদ্ধ পিতা দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছেন; তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য আমি টায়ারের একখণ্ড ইষ্টক দানেও প্রস্তুত নহি।"

অবরোধ চালান নিরর্থক দেখিয়া সালাহ্‌উদ্দীন শিবির ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে রমলা ইবেলিন ও দারুম অধিকার করিয়া ২৩শে আগস্ট মুসলমানের আস্কালনের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিল। আল্‌-আদিল মিশর বাহিনী লইয়া ভ্রাতার সাহায্যে আসিলেন। ভীম বেগে অবরোধ চলিতে লাগিল। ওদিকে তাঁহাদের খণ্ড যোদ্ধারা গাজা, নাক্রম ও বায়তে জিব্‌রিণ অধিকার করিল। সালাহ্‌উদ্দীন রাজাকে ও টেম্পলারদের অধ্যক্ষকে সেখানে আনাইয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহারা রক্ষী-সৈন্যগণকে আত্মসমর্পণে সম্মত করাইতে পারিলে তিনি তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিবেন। টায়ারের ন্যায় আস্কালনের রক্ষীরাও প্রথমে এই প্রলোভনে বশীভূত হইল না। কিন্তু এক পক্ষ কাল পরে তাহারা রাজাকে সন্ধির কথাবার্তা চালাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। শর্তানুসারে তাহারা নিরুপদ্রবে নগর ত্যাগের অনুমতি পাইল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুসলমানেরা আস্কালনে প্রবেশ করিল। এই জয়লাভের ফলে সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের যাবতীয় প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইল।

জেরুজালেম পুনরধিকার

আস্কালনের পর সালাহ্‌উদ্দীন জেরুজালেম পুনরধিকারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা আগামী পেন্টেকস্‌ট্‌ পর্ব পর্যন্ত জেরুজালেমে থাকিয়া চতুর্দিকে ১৫ মাইল পর্যন্ত ভূভাগ চাষবাস করিতে থাকুন। আর দরকার হইলে আমি আপনাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেও রাজী আছি। অতঃপর মুক্তির আশা থাকিলে নগর আপনাদেরই দখলে থাকিবে, নতুবা আমাকে উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি আপনাদিগকে ধন-সম্পত্তি সহ নিরাপদে খৃস্টান রাজ্যে পৌছাইয়া দিব।"

দুষ্টবুদ্ধি খৃস্টানদের মিথ্যাবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা স্মরণ করিলে সালাহ্‌উদ্দীনের এই প্রস্তাবকে শৌর্যপূর্ণ, এমন কি অসঙ্গত বীরত্ব-পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।* ফলে জেরুজালেমই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের এক নির্লজ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল। সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করায় বেলিয়ান পরিবারবর্গকে আনয়নের জন্য জেরুজালেমে গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া নাগরিকদের নেতৃত্ব গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন। তথাপি প্রতিনিধিরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি অস্ত্রবলে জেরুজালেম অধিকার করিবেন।

২০শে সেপ্টেম্বর পবিত্র নগরীর সম্মুখে তাবু পড়িল। এমতাবস্তায় নগরে তখন ৬০,০০০ লোক ছিল। তাহাদের অধিকাংশই গ্রীক ও প্রাচ্য খৃস্টান। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা খৃস্টান

* "The offer was chivalrous, even quixotic, when the bad faith of the Crusaders is remembered, and the lack of any security for their keeping a promise."—Lane-poole, 244.

রাজত্ব অপেক্ষা মুসলিম শাসনই অধিকতর পছন্দ করিত।* সালাহ্‌উদ্দীন প্রথমে পশ্চিম প্রান্তে স্থান গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানে অপরাহ্নকালে সূর্য-কিরণে যুদ্ধের অসুবিধা হয় দেখিয়া পাঁচ দিন পরে তিনি সৈন্যগণকে পূর্বদিকে সরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে দেখিয়া খৃস্টানেরা মনে করিল তিনি অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। কাজেই তাহারা গির্জায় গিয়া ইশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আনান্দোৎসবে মগ্ন হইল। কিন্তু পরদিন প্রাতে এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দর্শনে তাহাদের বিষাদের সীমা রহিল না। সালাহ্‌উদ্দীনের চল্লিশটি দুর্গধ্বংসী যন্ত্র রাত্রিকালে যথাস্থানে স্থাপিত হইল। তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারেরা সিংহদ্বারের বহিঃস্থ উপদুর্গ উড়াইয়া দেয়ার জন্য উহার নিম্নদেশে সুড়ঙ্গ খনন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১০,০০০ অশ্বারোহী রক্ষী সৈন্যদের আকস্মিক আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিল। প্রাচীরের উপরে অবিশ্রান্ত শর, প্রস্তর ও গ্রীক-অগ্নি* নিক্ষিপ্ত হইতে থাকায় শত্রুদের পক্ষে সেখানে পদক্ষেপ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং খনকেরা নির্বিঘ্নে দুই দিনের মধ্যেই উপদুর্গ প্রাচীরের নিম্নে এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ফেলিল। অবিলম্বে তাহারা উহা কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ফলে প্রাচীরের এক বৃহৎ অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রক্ষী-সৈন্যেরা বাধা দিতে আসিলে মুসলমানেরা তাহাদিগকে নগরমধ্যে তাড়াইয়া দিল।

নাগরিকেরা এখন নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। রমণীরা তাহাদের কুমারী কন্যাগণের কেশ কাটিয়া ফেলিল। আর পুরোহিতেরা ক্রুশ-কাষ্ঠ লইয়া মিছিল বাহির করিল। কিন্তু তাহাদের দুর্নীতি ও লাম্পট্যে ইশ্বরের কানের ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাজেই এই কাতর প্রার্থনা সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। অবশেষে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিলেও কেহ ভগ্নস্থানে পাহারা দিতে রাজী হইল না। অগত্যা নাগরিকেরা সন্ধি-শর্ত স্থির করিবার জন্য দলপতি

* "The most numerous portion of the inhabitants were composed of the Greek and Oriental Christians whom experience had taught to prefer the Mahometan before the Latin yoke." Gibbon, vi, 374.

* বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধে ব্যবহৃত এক প্রকার দাহ্য পদার্থ বিশেষ; জ্বলিলে ইহা পানিতেও নিভিত না।

বেলিয়ানকে সুলতানের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। মুসলমানেরা তখন ভগ্নস্থান হইতে খৃস্টানদিগকে হাঁকাইয়া দিয়া উপদুর্গ প্রাচীরে তাঁহাদের পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল। কাজেই সালাহ্উদ্দীন বেলিয়ানকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, 'কেহ বন্দীর সহিত সন্ধি করে কি?" কিন্তু তখনও নগর অধিকৃত হয় নাই। রক্ষী-সৈন্যেরা আবার আক্রমণ-কারীদিগকে বাহিরে তাড়াইয়া দিল। এদিকে বেলিয়ান তাহাকে ধমক দিলেন। অন্যান্য নগরের ন্যায় এখানেও দয়া না দেখাইলে নাগরিকেরা তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে নিহত, আল্-আক্সা মস্জিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থান বিনষ্ট, সমস্ত আসবাব-পত্র বিধ্বস্ত এবং মুসলমান বন্দিগণকে নিহত করিয়া একযোগে বাহিরে আসিয়া আক্রমণকারীদের হস্তে মৃত্যু বরণ করিবে।

এই ভীত প্রদর্শনে সালাহ্উদ্দীনের সুর নামিয়া আসিল। শূন্য নগরে প্রবেশ করা অপেক্ষা নাগরিকদিগকে কিছু সুবিধা দান করাই তাঁহার নিকট ভাল মনে হইল। তিনি ঘোষণা করিলেন, নগরের বাসিন্দারা যুদ্ধের বন্দী বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ দশটি প্রত্যেক রমণী পাঁচটি ও প্রত্যেক বালক বা বালিকা একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা নিষ্ক্রয় দিলে মুক্তি পাইবে। যাহাদের একটিও স্বর্ণমুদ্র নাই, হেনরী-প্রেরিত অর্থ হইতে ৩০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া এইরূপ ৭০০০ লোককে মুক্তিদান করা হইবে। নাগরিকেরা আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহারা দলে দলে সপরিবারে —সময় সময় নিষ্ক্রয়দানে অসমর্থ ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে নগর ত্যাগ করিতে লাগিল। কুকবারি ১০০০ আর্মেনিয়ান্কে চাহিয়া নিয়া মুক্তিদান করিলেন। অন্যান্য আমীরও কম বদান্যতা দেখাইলেন না। কিন্তু প্রধান পুরোহিত হেরাক্লিয়াস অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানহীন পাষণ্ড ছিলেন। নিজের বিপুল সম্পত্তি ব্যতীত তিনি মন্দিরে ধন-সম্পদ, সুবর্ণ পানপাত্র ও বাসনপত্র পর্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। অথচ এইগুলি দ্বারা বহুলোককে মুক্তিদান করা যাইতে পারিত।

৪০ দিন পর্যন্ত বিষাদ-ক্লিষ্ট জনতা দায়ুদ দ্বার দিয়া বিভিন্ন স্থানে গমন করিল। তথাপি হাজার হাজার দরিদ্র লোক নগরে রহিয়া গেল। এবার মুসলমানদের পক্ষে খৃস্টানদিগকে সদাশয়তাও

দানশীলতা শিক্ষা দেওয়ার সময় আসিল। আল্‌-আদিল সুলতানের নিকট হইতে ১০০০ ভৃত্য চাহিয়া নিয়া মুক্তিদান করিলেন। ইহাতে লজ্জিত হইয়া হেরাক্লিয়াস ও বেলিয়ানও অনুরূপ ভিক্ষা চাহিলেন। সদাশয় সুলতান তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিজের পালা আসিল। নিষ্ক্রয় দানে অসমর্থ সমস্ত বৃদ্ধ লোককে মুক্তিদানের আদেশ দিয়া অবিলম্বে এক ফরমান জারি করা হইল। ইহাতে দরিদ্র-মহলে আনন্দের সাড়া পরিয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক সেন্ট লজারসের দ্বার দিয়া নগর ত্যাগ করিল। এইরূপে সালাহ্‌উদ্দীনের দয়ায় অসংখ্য খৃস্টান মুক্তি লাভ করিল। *হস্পিটালারেরা তাঁহার ভীষণতম শত্রু হইলেও এক বৎসরকাল নগরে থাকিয়া রোগীর সেবা করার অনুমতি পাইল। গির্জার ক্রুশ ও পবিত্র চিহ্ন সমূহ তিনি বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ খলীফার নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। খৃস্টানদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সদাসয় সুলতান এই ইচ্ছা পূরণেও ক্ষান্ত রহিলেন। যে সকল নাইট যুদ্ধে নিহত বা বন্দী হন, তাঁহাদের স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীরা সাশ্রুনয়নে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিলে। তিনি অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আদেশে অবিলম্বে বন্দী নাইটগণকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইল। যাঁহাদের স্বামী, পিতা বা ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত হন, রাজকোষ হইতে আশাতীত অর্থ পাইয়া তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে সুলতানের জয়গান করিতে করিতে দরবার-গৃহ ত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ এই চিরস্মরণীয় ঘটনার পূর্বে সালাহ্‌উদ্দীন কখনও তাঁহার আশ্চর্য মহত্ব দেখাইবার এমন সুযোগ পান নাই। তাঁহার দয়া যুগবৎ আমাদের প্রশংসা ও ভক্তির উদ্রেক করে।*

এই করুণার গুরুতর অনুধাবন করিতে হইলে আরও দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। স্বার্থপর খৃস্টান পাদ্রী ও ধনবানেরা যখন স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে বন্দী-দশায় ফেলিয়া যায়, মুসলমানেরা তখন নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে। এই

* "This was the alms that Saladin made of a poor folk without number."—Archer and Kingsford, 280.

* "In these acts of mercy the virtue of Saladin deserves our admiration and love."—Gibbon, vi, 375.

মুক্ত খৃস্টানেরা আশ্রয় লাভের জন্য ত্রিপোলিসে উপস্থিত হইলে তথাকার কাউন্ট দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। এমন কি মুসলমানেরা করুণার বশবর্তী হইয়া তাহাদের যে সকল দ্রব্য গ্রহণ করে নাই, সেগুলি লুণ্ঠন করিয়া নেওয়ার জন্যও তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন।

এই প্রসঙ্গে ১০৯৯ খৃস্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডারদের হস্তে জেরুজালেমের পাশব বিজয়ের ('Savage conquest') কথাও পাঠকের স্মৃতি-পথে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন অসহায় মুসলমান নাগরিকদের মৃতদেহে রাজপথগুলি পূর্ণ হইয়া যায়। খৃস্টান সেনাপতি গড্‌ফ্রে ও টেঙ্ক্রেড্ শত-সহস্র দগ্ধ, অমানুষিকভাবে উপদ্রুত ও নিহত মুসলমানের শব পদদলিত করিয়া অশ্বারোহণে সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করেন। সেদিন নর-শোণিতে খৃস্ট-ভক্তেরা মন্দিরের ছাদ, চূড়া, এমন কি বেদী পর্যন্ত রঞ্জিত করে। নব্বই বৎসর পূর্বে ও পরে দুইটি বিভিন্ন জাতি কর্তৃক জেরুজালেম জয়ের পার্থক্যের সমালোচনা করিয়া লেনপুল সাহেব বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন, 'যদি সালাহ্উদ্দীন সম্বন্ধে আর কিছুই না জানিয়া শুধু তাঁহার জেরুজালেম অধিকারের কথাই আমাদের জানা থাকিত, তবে একমাত্র তাহাই তাঁহাকে সে যুগের, এবং সম্ভবতঃ যে কোন যুগের সর্বাপেক্ষ মহাপ্রাণ শূর ও দিগ্বিজয়ী বলিয়া প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট হইত।"*

* "If the taking of Jerusalem were the only fact known about Saladin, it were enough to prove him the most chivalrous and great-hearted conqueror of his own, and perhaps of any age."—Lane-poole 234.

টায়ার অবরোধ

পবিত্র নগর পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হওয়ায় তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। মুসলিম জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই সুসংবাদ পৌঁছাইবার জন্য সুলতানের কাতিব বা সেক্রেটারীর কঠিন পরিশ্রমে নিরত হইলেন। ইমাদুদ্দীন একদিনে একাই সত্তর খানা পত্র লিখিলেন। সারা জাহান হইতে সূফী, *ফকীহ ও তীর্থযাত্রীরা দ্রুতপদে জেরুজালেমে ছুটিয়া চলিলেন। অহরহ কোরআন পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা চলিতে লাগিল। আল্-আক্সা ও ওমর মস্জিদকে খৃস্টানেরা গির্জায় পরিণত করিয়াছিল। এখন এগুলি আবার পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইল। ৯ই অক্টোবর শুক্রবার বিশাল জন-মণ্ডলী জুম্মা নামাজ সমাপন করার জন্য আল্-আক্সা মস্জিদে সমবেত হইল। আলেপ্পোর প্রধান কাজী মর্মস্পর্শী ভাষায় খুৎবা পাঠ করিলেন। পঁচিশ বৎসর পূর্বে নুরুদ্দীন একখানা কারুকার্য খচিত মনোরম মিম্বর (বেদী) নির্মাণ করেন। সালাহ্উদ্দীন উহা আল্-আক্সা মস্জিদে স্থাপন করিলেন। ইহা অদ্যাপি সেখানে রক্ষিত আছে। মস্জিদের বৃহৎ কুলুঙ্গীতে আজিও সালাহ্উদ্দীনের খোদিত প্রস্তর-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

টায়ারের দক্ষিণে কেবল করক, সফেদ, বেলভয়ের ও মন্ট্রিয়েলই এখন ক্রুসেডারদের হাতে ছিল। তন্মধ্যে টায়ারই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া ১লা নভেম্বর সালাহ্উদ্দীন সেদিকে তাঁহার বিজয়ী-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। বার দিন পরে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিভিন্ন নগরের যে সকল রক্ষী-সৈন্যকে তিনি মুক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া টায়ারে সমবেত হইয়াছে। কন্রাড প্রাচীরের দৃঢ়তা সাধন এবং পরিখার গভীরতা ও প্রসারতা বর্ধন করিয়া উহা দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। জয়লাভের আশা ক্ষীণতর হইলেও সালাহ্উদ্দীন নগর অবরোধ

* ইসলামের পরিভাষায় 'ফকীহ' ইসলামিক আইনজ্ঞ ও ফিকাহ শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিকেই বুঝায়।

করিলেন। তাঁহার সতরটি যন্ত্র দিবা-রাত্রি দুর্গ-প্রাচীর ধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু টায়ারের প্রাকৃতিক অবস্থান অবরোধের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। লৌহ-শলাকার ন্যায় এক সংকীর্ণ ভূ-খণ্ড দ্বারা নগর মূল ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। ইহার উপর দিয়া অতি অল্প সৈন্যই আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারিত। রক্ষী-সৈন্য ব্যতীত উভয় পার্শ্বস্থ বজ্‌রা নৌকার ধনুর্ধরদের বিরুদ্ধেও তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইত। এগুলিকে বিতাড়িত করিবার জন্য বৈরুত হইতে দশ খানা রণপোত আনা হইল। উহারা খৃস্টানদের দাঁড়টানা জাহাজগুলিকে বন্দরের মধ্যে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর মুসলিম নৌ-বহরের অর্ধাংশ অসতর্ক অবস্থায় শত্রুপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হইল। অবশিষ্ট জাহাজগুলি অপর্যাপ্ত বিধায় বৈরুত প্রত্যাবর্তনের আদেশ পাইল। খৃস্টানেরা উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে নাবিকেরা আতঙ্কে তীরে নামিয়া পড়িল। এই সুযোগে শত্রুরা তাহাদের জাহাজগুলি আগুনে পোড়াইয়া দিল। তীরেও মুসলমানদের ভাগ্য প্রতিকূল অবস্থায় পড়িল। তাহারা উপদুর্গ-প্রাচীরে উঠিয়া মূল প্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করিলে কন্‌রাডের নেতৃত্বে রক্ষী-সৈন্যেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল।

জল, স্থল সর্বত্র পরাজিত হইয়া সালাহ্‌উদ্দীন এক সমর-সভা আহবান করিলেন। তখন ডিসেম্বরের শেষভাগ। বৃষ্টি ও তুষার পাতের ফলে এ সময় প্রান্তর কর্দম-সমুদ্রে পরিণত হয়। শীত ও আর্দ্রতার দরুণ অশ্ব ও সৈন্যদলে নানা রোগ দেখা দেয়। এই সকল অসুবিধা দেখাইয়া অনেকেই প্রত্যাবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিলেন, সমুদ্রোপকূলে টায়ারই ফ্র্যাঙ্কদের একমাত্র আশা-ভরসা। ইহার পতন হইলে ইউরোপ হইতে সাহায্য-কারী সৈন্য আসিয়া কোথাও আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। ইহাদের যুক্তি গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু অবশেষে সংখ্যাধিক্য বশতঃ ভীরুদলই জয়লাভ করিল। ১১৮৮ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মুসলিম বাহিনী দল ভাঙ্গিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। সুলতান তাঁহার ব্যক্তিগত সৈন্যগণকে একরে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

টায়ার ত্যাগ সালাহ্‌উদ্দীনের বিজয়-গতির পরিবর্তন-বিন্দু (turning point)। ইব্‌নুল আসীর ন্যায়তঃ ইহার নিন্দা করিয়া

গিয়াছেন। এই মারাত্মক ভ্রমের ফলে তাঁহার যে ক্ষতি হয়, কিছুতেই তাহার প্রতিকার করা সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য সালাহ্‌উদ্দীনের পক্ষে যে কিছুই বলিবার নাই, এমন নহে। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবরোধ চালাইতে বা নিষ্কর্মা বসিয়া থাকিতে গেলে সৈন্যদের উৎসাহ হ্রাস পাইত। অপরদিকে ক্লান্তিকর অধঃখনন ও অবরুদ্ধ নাগরিকদের অবিশ্রান্ত আক্রমণে তাহাদের বিরক্তি বর্ধিত হইত। তদুপরি এরূপ মিশ্রিত বাহিনীতে রোগ, হিংসা-কলহ ও অসন্তোষ সৃষ্টি অনিবার্য ছিল বলিয়া পরিণামে সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারিত। তজ্জন্য সালাহ্‌উদ্দীন বরাবরই দীর্ঘ অবরোধ পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক দয়াও এরূপ অবরোধ ত্যাগের অন্যতম কারণ। তিনি এতদূর দয়ার্দ্র-চিত্ত ছিলেন যে বলপূর্বক নগর আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও রক্ষী-সৈন্যেরা আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার জন্য তিনি তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইতেন। কিন্তু তাহারা যে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিত, এ কথা কখনও তাঁহার মনে হইত বলিয়া বোধ হয় না। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেই দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইত। কিন্তু অতিরিক্ত দয়া ও প্রতিজ্ঞাপালনের কঠোরতা তাঁহার পরিণাম-দর্শিতা মাটি করিয়া দেয়। এইভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত খৃস্টান সৈন্যে টায়ার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রক্ষীদের অপ্রত্যাশিত শক্তিবৃদ্ধির জন্য সালাহউদ্দীনের অপরিণামদর্শিতাই প্রধানতঃ দায়ী।

অবরোধে যতই বাধা থাকুক না কেন, টায়ার জয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ কিছুতেই সালাহ্‌উদ্দীনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। নূতন নৌ-বহর গঠন করিয়া খৃস্টান জাহাজগুলিকে বিনষ্ট করা এবং পরিখা পূর্ণ করিয়া প্রাচীর ধ্বংসের চেষ্টা করাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল। এই চেষ্টায় তাঁহার অর্ধেক সৈন্য নষ্ট হইলেও ইহাতে পরাঙ্মুখ না হইলেও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। জলে-স্থলে নগর অবরোধ করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া ইহার বিপুল অধিবাসীবর্গকে অনাহারে মারার ব্যবস্থা করিতে তিনি যে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহা সমর্থন করার কোনই উপায় নাই। তাঁহার এই রাজনীতিজ্ঞানহীনতার ফলে টায়ার বিচ্ছিন্ন খৃস্টানদের

পুনর্মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহারা প্যালেস্টাইনের উপকূলে তাহাদের হৃত রাজ্য ও গৌরবের আংশিক পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়। মাত্র এই একটি নগর তাহাদের অধিকারে না থাকিলে একরে তৃতীয় ক্রুসেডের কথা কখনও শুনা যাইত কিনা, সন্দেহ।

উত্তরাঞ্চলে অভিযান

টায়ারের অবরোধ উঠাইবার শোচনীয় পরিণাম সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিয়মান হইল না। পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে ইউরোপের সময় লাগিল। ইত্যবসরে সালাহ্উদ্দীন শীত ঋতু একরে অতিবাহিত করিলেন। দুইজন পূত-চরিত্র লোক সেন্ট জনের হাসপাতালে নিযুক্ত হইলেন। বিশপের প্রাসাদকেও হাসপাতালে পরিণত করা হইল। সুলতান উভয় হাসপালের জন্যই প্রচুর স্থায়ী বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। দুর্গ ও প্রাচীরাদির দৃঢ়তা সাধনের জন্য কারাকুশ একরে আহূত হইলেন। বেলভয়ের বা কাউকাব অবরোধ ও দামেশ্ক পরিদর্শন করিয়া ১৪ই মে সালাহ্উদ্দীন উত্তাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। ত্রিপোলিসের কাউন্টি ও এন্টিয়কের প্রিন্সিপালিটি জয় তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি ত্রিপোলিস অবরোধ করিলেন। কিন্তু দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তদুপরি সিসিলীর রাজা উইলিয়াম তাঁহার বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি মার্গারেটাসের অধীনে ৫০০ নাইট ও ৫০ খানা দাঁড়টানা জাহাজ প্রেরণ করিলেন। কন্রাডও বিপন্ন প্রতিবেশীর (এন্টিয়কের প্রিন্স বহেমণ্ডের পুত্র রেমণ্ড) সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিলেন। কাজেই সালাহ্উদ্দীন ত্রিপোলিস জয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া হিসনুল আক্রাদ (ক্রেকডেস চেভালিয়ার্স) বা কুর্দ দুর্গের নিকটে মূল শিবিরে চলিয়া গেলেন।

ইমাদুদ্দীনের নেতৃত্বে মেসোপটেমিয়ার জায়গীরদারেরা তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইলে ১লা জুলাই শুক্রবার সালাহ্উদ্দীন বিজয়-অভিযানে বহির্গত হইলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহাকে বাধা-দান করিবার মত শক্তি তখন খৃস্টানদের ছিল না। কাজেই দুর্গের পর দুর্গ ও নগরের পর নগর তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল। আন্তারতুস্ বা টর্টোসার উপরই সর্বপ্রথম তাঁহার নজর পড়িল। ৩রা জুলাই অবরোধ আরম্ভ হইল। তাঁহার চরেরা শিবির স্থাপন করিবার পূর্বেই সৈন্যেরা একটি দুর্গ অধিকার করিয়া উহা দগ্ধ ও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। কিন্তু আর একটি দুর্গ খৃস্টানদের দখলে রহিয়া গেল। ভেলোনিয়ার অধিবাসীরা নগর ত্যাগ করিয়া

পলায়ন করিল। কিন্তু বৃহৎ মার্গাৎ দুর্গ মুসলমানদিগকে বাধাদানে সমর্থ হইল। জেবেলার লোকেরা সালাহ্উদ্দীনকে দেখিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ১৫ই জুলাই নগর-রক্ষী দুর্গও আত্ম-সমর্পণ করিল। পরবর্তী শুক্রবারে লাদিকিয়া অধিকৃত হইল। আবার তৎপরবর্তী শুক্রবারে মুসলমানেরা পাহাড়ের উপরস্থ বৃহৎ সেওন দুর্গ দখল করিল। রক্ষী-সৈন্যেরা বন্দী বলিয়া পরিগণিত হইলেও জেরুজালেমের অনুরূপ শর্তে তাহাদিগকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইল। আগস্টের তিন শুক্রবারে বুকাস, অশ্-শুগর ও শার্স্মিন শহর সালাহ্উদ্দীনের দখলে আসিল। তাঁহার বিজয়-স্রোত সর্বত্র অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

বার্জুয়া দুর্গের দুর্ভেদ্যতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ভীষণ সংগ্রামের পর ২৩শে আগস্ট ইহাও মুসলমানদের অধিকারে আসিল। অধিবাসীরা বন্দী ও প্রচুর মালে গাণীমাত বিজেতার হস্তগত হইল। শাসনকর্তা ও তাঁহার আত্মীয়েরা এন্টিয়কের প্রিন্সের জ্ঞাতি বলিয়া মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক নব-বিবাহিত যুবককে মুসলমানেরা তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই সংবাদে সালাহ্উদ্দীন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই সদাশয়তা বিস্মৃত হওয়া বহেমণ্ডের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মুসলমানেরা দারবেশক ও বাগরাস নামক দুইটি প্রয়োজনীয় সীমান্ত দুর্গ দখল করিলে প্রিন্স শান্তি প্রার্থনা করিলেন। সালাহ্উদ্দীনের সৈন্যেরা তখন বিজয়-ক্লান্ত। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির প্রতি তাহাদের রীতিমত বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। ক্রমাগত তিন মাস কাল ঝঞ্ঝার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়া তাহারা গৃহগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আট মাসের মিয়াদে প্রিন্সের সহিত তাহাদের এক সন্ধি হইল (১লা অক্টোবর)। শর্তানুসারে সমস্ত মুসলমান বন্দী মুক্তি পাইল। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এন্টিয়ক রক্ষার কোন সুব্যবস্থা না হইলে সুলতানের হস্তে নগর সমর্পণের কথা রহিল।

আলেপ্পো ও হামায় সাদর অভ্যার্থনা লাভের পর ২০শে অক্টোবর সালাহ্উদ্দীন দামেশ্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন পবিত্র রমজান মাস। এ সময় প্রত্যেক মুসলমানই বিশ্রাম ও গৃহ-সুখ কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সালাহ্উদ্দীন আরামের চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া

প্রখর শীতের নিদারুণ কষ্ট উপেক্ষা করিয়া কেবল ব্যক্তিগত লোক-জন সহ টেম্পলারদের অধীন সফেদ অবরোধে যাত্রা করিলেন। মুষলধারে বারিপাত হওয়ায় সমগ্র ভূভাগ জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। মুসলমানেরা তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিল না। দুর্গধ্বংসী যন্ত্রগুলি যথাস্থানে স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সালাহ্‌উদ্দীন শয্যা স্পর্শ করিতেও রাজী হইলেন না। এক মাস অবরোধের পর ৬ই ডিসেম্বর রক্ষী-সৈন্যেরা আত্ম-সমর্পণ করিল। তাহারা সাময়িক সম্মানের সহিত টায়ার গমণের অনুমতি পাইল। অতঃপর বেলভয়েরের পালা আসিল। উর্দ্ধে প্রবল ঝন্ঝা ও বৃষ্টিপাত, পদ-নিম্নে কর্দ্দম-সমুদ্র। তথাপি অবরোধ চলিতে লাগিল। বিপুল ক্ষতি স্বীকারের পর মুসলমানেরা প্রাচীরের একাংশ ভগ্ন করিতে সমর্থ হইল। ১১৮৯ খৃস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী হস্পিটালারেরাও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের পদাঙ্কানুসরণ করিল। ঠিক এই সময় করক দুর্গের পতন-সংবাদ আসিল। আল্-আদিল মিসরবাহিনী লইয়া ইহা অবরোধ করেন। খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গেলে রক্ষী-সৈন্যেরা অশ্বমাংশ ভোজন করিয়াও আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। এমন কি তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে পর্যন্ত তাহারা দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দেয়। সুলতানের আদেশে ভৃত্যেরা তাহাদিগকে খুঁজিয়া আনিল। তিনি তাহাদের মুক্তি-পণ দিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে খৃস্টান রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। শত্রুর প্রতি এরূপ সদাশয়তা জগতে দুর্লভ।

সফেদ, বেলভয়ের ও করক মুসলমানদের হস্তগত হওয়ায় খৃস্টানরা যে আর কখনও আরব ও মিসরের শান্তশিষ্ট সওদাগর ও হজ্জ-যাত্রীদের উপর অত্যাচার করিবে, সে আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু ঘটনা স্রোত শীঘ্রই প্রমাণ করিল যে, টায়ারে খৃস্টানদের পুনর্মিলনে বাধা না দিয়া বরং সহায়তা করায় সালাহ্‌উদ্দীন মারাত্মক ভুল করিলেন। আর এই ভুলের কারণে তিনি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। কিন্তু সেই তুলনায় তাহার এই বিজয় লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

একরের যুদ্ধ

জেরুজালেমের পতন-সংবাদ ইউরোপে পৌঁছিলে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। 'সোনার প্রাচ্যে' খৃস্টান সভ্যতার একমাত্র কেন্দ্র ও বাইবেলোক্ত পবিত্র নগররাজি বিধর্মীদের হস্তগত হওয়ায় তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য খৃস্টান জগত স্বভাবতঃই অধীর হইয়া পড়িল। পোপ নূতন ক্রুসেডের ভেরী বাদন করিলেন। ধর্মযুদ্ধে যাহাদের মৃত্যু হইবে, তিনি তাহাদের সর্বপ্রকার পাপ-মোচনের ভার লইলেন।* কাজেই পাপী-মহলে যুদ্ধোদ্যমের সাড়া পড়িয়া গেল। নৃপতিবৃন্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রিচার্ডই সর্বপ্রথম ক্রুশ গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ অগস্তাস ইংল্যাণ্ডের সহিত চিরন্তন বিবাদ ভুলিয়া গিয়া ক্রুসেডে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ক্যান্টরবারীর বল্‌ডুইন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া খৃস্টান জগতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি লোকের সম্পত্তির দশমাংশ 'সালাদিন কর' রূপে গৃহীত হইল। হতভাগ্য ইহুদিরাও বাধ্য হইয়া যুদ্ধ-ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিল। ইল্যাণ্ডে সংগৃহীত অর্থের সাত ভাগের ছয় ভাগই স্বল্পসংখ্যক ইহুদির নিকট হইতে বলপূর্বক আদায় করা হয়। তৎপরে আসিল লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পালা। তাহাদের প্রত্যেকটি গৃহই লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। লণ্ডনের রাজপথে খৃস্টানেরা যে সকল ইহুদির সাক্ষাৎ পাইল, তাহাদের প্রত্যেককে হত্যা করিল। ইয়র্কের ইহুদিরা প্রাণভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। খৃস্টানেরা উহা অবরোধ করিলে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া সকল অত্যাচারের হাত এড়াইল। যে অল্প কয় জনের এই বীভৎস কার্য করিবার সাহস হইল না, তাহারা প্রাণ রক্ষা পাইলে ধর্ম ত্যাগ করিতে স্বীকার করিল। অবরোধকারীরাও তাহাতে সম্মত হইল। কিন্তু হতভাগ্যেরা সরল বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ

* "The Pope had promised remission of sins to all who should lose their lives while on the Crusade."—That cher ard Schwill, i, 176.

করা মাত্রই তাহারা তাহাদিগকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ করিল।* আর সেই ইংরেজেরাই এখন ইসলামের প্রধান মিত্র।

খৃস্টানদের অদম্য উৎসাহ সহজেই উদ্দীপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের যুদ্ধ-যাত্রায় বিলম্ব ঘটিল। সিসিলির উইলিয়াম ক্ষিপ্রগতিতে ত্রিপোলিসের সাহায্যে ছুটিয়া গেলেও ইংরেজ ও ফরাসীরাজেরা ১১৮০ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পূর্বে পোতারোহণ করিতে পারিলেন না। জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা তখন সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধ। তথাপি তাঁহার শৌর্যবীর্য বেশ অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলিম সভ্যতার ভক্ত হইলেও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এক বিরাট বাহিনী লইয়া ১১৮৯ খৃস্টাব্দের মে মাসে পুণ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ধর্ম-যোদ্ধার গৌরব লাভ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। পথিমধ্যে তিনি সালেফ নদীর প্রখর স্রোতে তলাইয়া গেলেন (জুন ১০,১১৯০)। তাঁহার বিশাল বাহিনীর একাংশ মাত্র তৎপুত্র (সুয়েবিয়ার ডিউক) ফিলিপের অধীনে মন্থর গতিতে প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হইল।

এদিকে ফ্র্যাঙ্কেরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। রাণী সিবিলা সালাহ্-উদ্দীনের নিকট আস্কালনের প্রতিজ্ঞা পালনের দাবী করিয়া বসিলেন। তদনুসারে রাজা গাঈ দশ জন বন্দী সহ ১১৮৮ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে টর্টোসায় আনীত হইলেন। তাঁহারা কখনও সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা হইল। মন্টফের্রাতের বৃদ্ধ মার্কোসে টায়ারে তাঁহার পুত্রের ও তোরণের হাম্ফ্রে তাঁহার বিধবা মাতার নিকট প্রেরিত হইলেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণের ফিকির উদ্ভাবনে লাগিয়া গেলেন। পুরোহিতেরা তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাপালনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিদান করিলে তাঁহারা বহু নাইট ও স্বেচ্ছাসেবক লইয়া টায়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কনরাড গাঈর বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় তিনি বেলফোর্টের সম্মুখস্থ মুসলিম বাহিনীকে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করিয়া একর যাত্রা করিলেন। সিসিলির

* "Every Jew in the street was cut down; every house belonging to a Jew was plundered and burnt... In a few hours the work of death was done,...the Christians rushing in slaughtered every living thing within the walls."—Cox, Bart, 118-9.

নৌ-বহর তাঁহার অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হইল (আগষ্ট, ১১৮৯)।

কিছুদিন পরে ডেনমার্ক ফ্রিজিয়া হইতে ১২,০০০ সৈন্য সহ ৫০ খানা জাহাজ আসিয়া গাঈর সহিত যোগদান করিল। ফলে ক্রুসেডারদের সংখ্যা বত্রিশ হাজারে উঠিল। ইহাদের মধ্যে ২,০০০ কেবল নাইট ও অবশিষ্ট পদাতিক। বিউভায়েসের বিশপ ও এভেস্‌নেসের বিখ্যাত নাইট জেম্‌স শীঘ্রই বহু লোক লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। এভাবে অবিরত সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনে দিন দিন ক্রুসেডারদের শক্তিবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা না করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন তখন বেলফোর্ট অবরোধে শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। অথচ নিজে না গিয়া একদল সৈন্য পাঠাইলে তাহারা সহজে এই অবরোধ চালাইতে পারিত। আর ইত্যবসরে রাজার ক্ষুদ্র বাহিনী শক্তিশালী হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা অনায়াসে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু টায়ারের শোচনীয় ভুল আবার এখানে অভিনীত হইল। ফলে এপ্রিল হইতে জুলাই পর্যন্ত চারিটি মূল্যবান মাস বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের এত অধিক বলবৃদ্ধি ঘটিল যে, তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

যে অল্প কয়েক জন নাইট হিত্তিনের যুদ্ধ হইতে কোনরূপে পলায়নে সমর্থ হন, সিডনের রেজিনাল্ড তাঁহাদের অন্যতম। তিনি এই সময় বেলফোর্টের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই ধূর্ত নাইট দেখিলেন কোন ছুতায় কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিতে পারিলেই খৃস্টানদের পক্ষে শক্তি সংগ্রহের সুবিধা হইবে। তজ্জন্য তিনি সালাহ্‌উদ্দীনকে বলিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ টায়ারে আছেন; মার্কোসের হিংসার কবল হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধারের জন্য তিন মাস সময় পাইলে তিনি বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছাড়িয়া দিবেন। সুলতানের চরিত্রের দুর্বলতা সহজেই তাঁহার নিকট ধরা পড়িল। তিনি ইসলাম গ্রহণের ভাণ দেখাইয়া তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া দিলেন। একজন অ-মুসলমানকে দীক্ষিত করার আশায় সালাহ্‌উদ্দীন আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুলতানের গুপ্তচর-বিভাগ অপদার্থ না হইলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, রেজিনাল্ড মার্কোসের একজন বিশিষ্ট বন্ধু;

আর কল্পিত বিপদের আশঙ্কায় কিল্লাদারের মায়া-কান্না ভীষণ ধাপ্পা-বাজি মাত্র। কারণ, তিনি যখন ধর্ম-বিষয়ক তর্ক-বিতর্কে হৃদয়-মন ঢালিয়া দিতেছিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা তখন দুর্গের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিতেছিল। কাজেই জয়লাভের আশা আরও সুদূর-পরাহত। অবশেষে যখন তাঁহার চাতুরী ধরা পড়িল, তখন আগষ্ট মাস। রাজা গাঈ ইতিপূর্বে একর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সালাহ্‌উদ্দীন মারাত্মকরূপে প্রতারিত হইলেন। তথাপি তিনি রেজিনাল্ডকে হত্যা না করিয়া শুধু কারাগারে পাঠাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন।

খৃস্টানদের রণ-সজ্জা সালাহ্‌উদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল, এমন নহে। টায়ারের নিকটে তাঁহার একটি বহিঃসেনানিবাস ছিল। জুলাইর প্রথম দিকে তাহাদের সহিত রাজসেনার একাধিক খণ্ডযুদ্ধ হয়। তাহার একটি যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ও ঘটে। সালাহ্‌উদ্দীন ইহা স্বচক্ষে দর্শন করেন। অথচ রাজা গাঈ সমরোদ্যম পণ্ড করার জন্য কোনই চেষ্টা না করিয়া তিনি রেজিনাল্ডের চাতুরী ধরা না পড়া পর্যন্ত তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বেলফোর্টের সমুখে নিষ্কর্মা বসিয়া রহিলেন। অবশেষে ২৭শে আগষ্ট যখন সংবাদ আসিল, ফ্রাঙ্কেরা বাস্তবিকই একরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখন তিনি অবরোধ উঠাইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অবশ্য বেলফোর্ট অবরোধের জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া যাইতে তাঁহার ভুল হইল না। সাত মাস পরে রক্ষী-সৈন্যেরা তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। অথচ এইভাবে অবরোধ চালাইবার জন্য একদল সৈন্য রাখিয়া তিন মাস পূর্বেই তিনি শত্রুপক্ষকে বাধা দানে গমন করিতে পারিতেন। সমর-সভা তাঁহাকে বিপরীত পরামর্শ দিয়া থাকিলে তাহা মানিয়া চলা কিছুতেই তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

'যদি দশ বৎসরের যুদ্ধের জন্য ট্রয় নগরী বিখ্যাত হইয়া থাকে, যদি খৃস্টানদের বিজয় লাভে এন্টিয়কের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে যে একরের জন্য সমগ্র বিশ্ব বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, উহা নিশ্চিত অমর যশের অধিকারী।' একর এক জিহবাকৃতি ভূখণ্ডে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ দিক ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে; উত্তর ও পূর্ব দিকে স্থল, অন্যদিকে সমুদ্র-জল, পশ্চাৎভাগে মিনা বা পোতাশ্রয়। নগরে

তখন একটিমাত্র পাড়া ছিল। উহার পরিধি ৩ মাইল। একটি শৃঙ্খল ও 'পতঙ্গ-দুর্গ' নামে এক ভয়াবহ গিরি-দুর্গ পোতাশ্রয় রক্ষা করিত। 'অভিশপ্ত দুর্গ' নগরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল। উত্তর-দক্ষিণে ২০ মাইল বিস্তৃত বৃহৎ প্রান্তর শোভা পাইত। বেলুস নদীর দুইটি দীর্ঘ শাখা বহু প্রশাখাসহ ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। সমুদ্র-তট হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নাতুচ্চ পাহাড়-শ্রেণীতে সামরিক আড্ডা স্থাপনের খুব সুবিধা ছিল। ইহার দুই মাইল পশ্চাতে প্রান্তরের পূর্ব সীমায় লেবানন গিরি-শ্রেণীর দক্ষিণাংশ অবস্থিত। শত্রুর আক্রমণ ও শীত ঋতুতে নিম্নভূমির ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে এখানে নিরাপদে আশ্রয় লওয়া যাইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত এখান হইতে বিপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণেরও সুবিধা ছিল।

২৮শে আগষ্ট রাজা গাঈ একরের সিংহদ্বারের ঠিক সমুখে তেল-উল-মুসল্লীন বা উপাসকের পাহাড়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দুই দিন পরে সালাহ্উদ্দীনও সেখানে হাজির হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, অবরোধকারীগণকেই অবরোধ করা। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে বেলুস নদী হইতে আল্-আয়্যাদিয়া পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত করিলেন। এক মাস পরে তিনি আরও উত্তরে সরিয়া গেলেন। তাঁহার সৈন্যেরা একরের উত্তরস্থ সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমগ্র স্থান বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং আল্-আয়্যাদিয়ায় তাঁহার শিবির পড়িল। ফ্রাঙ্কেরা তখনও সম্পূর্ণরূপে নগর অবরোধ করার মত শক্তিশালী হয় নাই। কাজেই তাকিউদ্দীন অনায়াসে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন (১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর)। সালাহ্-উদ্দীন নিজেও একবারে নগরে গমন করিলেন। দুর্গে যথেষ্ট রক্ষী-সৈন্য ও প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ছিল। কাজেই সহসা উহার পতনের আশঙ্কা ছিল না।

প্রথমে উভয় পক্ষে খণ্ড-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমে সৈন্যেরা এই সামান্য ব্যাপারে এত অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, সহসা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলিত। যখন তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িত, তখন দুই দলের বালকদের মধ্যে মারামারি লাগাইয়া দিয়া তামাসা দেখিত। পক্ষান্তরে উভয় পক্ষে বর্বরোচিত কার্যও অনুষ্ঠিত হইত। যে সকল খৃস্টান তাহাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিত

দুর্দান্ত বেদুইনেরা তাহাদের মস্তক কাটিয়া পুরস্কারের জন্য সুলতানের নিকট লইয়া যাইত। খৃস্টান রমণীরাও তুর্কী বন্দীদের চুল ধরিয়া টানিত, তাহাদিগকে লজ্জাকররূপে অপ-প্রয়োগ করিত, শেষে তাহাদের মস্তক কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিত।

এইরূপে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে চলিতে অবশেষে যথারীতি শক্তি পরীক্ষার সময় আসিল। ৪ঠা অক্টোবর সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই ফ্র্যাঙ্কেরা সচল হইয়া উঠিল। মুসলিম বাহিনীর সমান করিয়া সমুদ্র হইতে বেলস পর্যন্ত পূর্ণ দুই মাইল ব্যাপিয়া তাহাদের সৈন্যদল একরের চতুর্দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত হইল। চিরাচরিত নিয়মে ধনুর্ধরগণ সমুখে স্থান গ্রহণ করিল। তৎ-পশ্চাতে নাইটগণ ও পদাতিক সৈন্যদল ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। তাহারা চারিভাগে অগ্রসর হইল। রাজা দক্ষিণ পার্শ্বের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সমুখে রেশমী চন্দ্রাতপের নিম্নে একখানা বাইবেল স্থাপিত হইল। মন্টফের্ট-রাতের কন্‌রাড ও থুরিঞ্জির সম্ভ্রান্ত জমিদার দুই কেন্দ্র-ভাগদ্বয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আর টেম্পলারেরা বাম পার্শ্বে সমবেত হইল। সালাহ্‌উদ্দীন স্বয়ং মুসলিম-কেন্দ্র পরিচালনা করিলেন এবং শাহ্‌জাদা আল্-আফজাল ও আজ্-জহির দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। কেন্দ্রভাগের দক্ষিণাংশ মসুল ও দিয়ার বকরের সৈন্য সাহায্যে এবং বাম অংশ তাইগ্রীস তটের আমীরদের অধীনায়কতায় পরিচালিত কুর্দ জাতি, হার্‌রানের কুকবারীর অনুচরবৃন্দ ও সিঞ্জারের সৈন্যদল দ্বারা গঠিত হইল। উত্তর সিরিয়ার উৎকৃষ্ট সৈন্যরা দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। সালাহ্‌উদ্দীনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিউদ্দীন এই অংশের পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হইলেন। শের্কুর মিসর-বিজয়ী মামলূকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রবীণ সৈন্যেরা বাম পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় স্থান—দক্ষিণ ও সর্বোত্তর প্রান্তের ভার মুসলিম বাহিনীর সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্যের উপর অর্পিত হইল। কিন্তু কেন্দ্র-ভাগ সালাহ্‌উদ্দীনের শরীর-রক্ষীগণ ব্যতীত মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্তানের স্বল্প-পরীক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে গঠিত হওয়ায় উহা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রহিয়া গেল।

সূর্যোদয়ের চারি ঘন্টা পরে একরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে ফ্র্যাঙ্কেরা মুসলমানদের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিল। তাকিউদ্দীন

তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সৈন্যগণকে পশ্চাতে অবতরন করিতে আদেশ করিলেন। ফ্র্যাঙ্কেরা তাঁহার অনুসরণে প্রলুব্ধ হইলে সহসা গতি পরিবর্তন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করাই ছিল এই কৌশলের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ সালাহ্উদ্দীন মনে করিলেন, তাহারা শত্রু-সৈন্যের সমুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। কাজেই তিনি কেন্দ্র-ভাগের কিয়দংশ তাহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বাম পার্শ্ব শত্রুগণকে বিতারিত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু সালাহ্উদ্দীনের কেন্দ্রভাগের দৌর্বল্য ফ্র্যাঙ্কদের দৃষ্টি এড়াইল না। তাহাদের অশ্বারোহী ও পদাতিকেরা ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে সেদিকে অগ্রসর হইল। মুসলমানদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া তাহারা একযোগে প্রবলবেগে তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। দিয়ার বকরের সৈন্যগণকেই আক্রমণের প্রচণ্ডতা ভোগ করিতে হইল। ফলে তাহারা বিশৃঙ্খল হইয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। নাইটেরা চিরদিনই অসংযত ও উগ্রমস্তিষ্ক। তাহারা পলায়িত শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাহাড়ে সেনাপতির বাসস্থানে উপনীত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া শিবির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এত দ্রুত ধাবন করিল যে, পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এখন নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহারা যত দ্রুত পারিল, মূল বাহিনী অভিমুখে ধাবিত হইল। সালাহ্উদ্দীনের বামপার্শ্ব তখনও অক্ষতদেহে দৃঢ়ভাবে স্ব-স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। তাঁহার কেন্দ্রভাগের যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি মুহূর্তে তাহাদিগকে একত্র করিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী ফ্র্যাঙ্কেরা যখন তাঁহার শিবির হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন তিনি উচ্চস্বরে তাঁহার বিখ্যাত রণনাদ "আ'লাল ইসলাম" উচ্চারণ করিয়া তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের সৈন্যেরাও তাঁহার সাহায্যার্থ আহূত হইল। ঠিক এই সময় অবরুদ্ধ সৈন্যগণও সহসা নগর হইতে বহির্গত হইয়া ফ্র্যাঙ্কদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল। এইভাবে উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়া শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা যে যে দিকে পারিল, বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিল। সঙ্গিগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক বাহিনীর অন্যান্য অংশও ভীতিগ্রস্ত হইয়া তাহাদের শিবিরে পলাইয়া গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা অনুসরণকারিগণকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করিল।

খৃস্টানদের মতে এই যুদ্ধে তাহাদের ১৫০০ সৈন্য নিহত হয়। বাহাউদ্দীনের মতে এই সংখ্যা চারি হাজারেরও অধিক। হত্যা অপেক্ষা পলায়নেই মুসলমানদের ক্ষতি হয় বেশী। দিয়ার বকর বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কুর্দদের সর্দার ও অপর একজন আমীর সহ ১৫০ জন সৈন্যের মৃত্যুর কথা ইসলামের ইতিহাসে লিখিত আছে। পক্ষান্তরে খৃস্টানদের মতে নিহত সৈন্যদের সংখ্যা ইহার দশ গুণ। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কোন পক্ষ হইতেই প্রকৃত সংখ্যা জানিবার উপায় নাই। তবে পরাজিত পক্ষই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক।

একর অবরোধ

একরের যুদ্ধের পর সালাহ্‌উদ্দীনের উচিত ছিল খৃস্টান শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা। কিন্তু তাঁহার শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদের তখন আর যুদ্ধ করার মত মেজাজ ছিল না। সুলতান নিজেও সিরিয়ার উৎকট জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন। তথাপি তিনি এক সমর-সভা আহবান করিলেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দান করাই সাব্যস্ত হইল। টায়ার ও বেলফোর্টের মারাত্মক ভুল আবার এখানে অভিনীত হইল। রোগাক্রান্ত সুলতান ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৬ই অক্টোবর আল্‌-খর্‌রুবা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শীঘ্রই বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় সংগ্রাম পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা খৃস্টানদের আনুকূল্য করায় তাহারা এক বৃহৎ খাত কাটিয়া শিবির নিরাপদ করার সুযোগ পাইল। ফলে ১১৮৯ খৃস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর যে অবরোধ শেষ হইতে পারিত, ক্লান্তিকরভাবে প্রায় দুই বৎসর চলিয়া অবশেষে খৃস্টানদের বিজয়লাভে উহার সমাপ্তি ঘটিল।

সালাহ্‌উদ্দীন অবসরকাল নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্যয় করিলেন। আল্‌-আদিল শীঘ্রই মিসর-বাহিনী লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নৌ-সেনাপতি লুলুও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ৫০ খানা জাহাজ লইয়া একরে আসিলেন। শত্রুদের মূল্যবান দ্রব্যপূর্ণ দুইখানা জাহাজ তাঁহার হস্তে ধৃত হইল। ১০,০০০ নাবিক লইয়া তিনি তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কর্দম-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া খৃস্টান শিবিরের নিকটবর্তী হইতে পারিল না। এদিকে সুলতানের উৎকণ্ঠার এক নূতন কারণ জুটিল। তিনি তাঁহার মিত্র কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট আইজাক ও আর্মেনিয়ার ক্যাথলিক ভূপতির নিকট হইতে ফ্রেডারিকের মৃত্যু ও জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ পাইলেন। মেসোপটেমিয়ার নবাগত সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। সালাহ্‌উদ্দীনের অকর্মণ্য বন্ধুরা এই সঙ্গে জার্মান বাহিনীর দৌর্বল্যের সংবাদটাও পাঠাইলে তাঁহাকে এইভাবে পঙ্গু সাজিতে হইত না। অবশ্য সৈন্যসংখ্যা হ্রাস

পাওয়া সত্ত্বেও আপাততঃ তাঁহারই জয় হইতে লাগিল। দামেশ্কের জনৈক যুবক এক প্রকার গ্রীক-অগ্নি প্রস্তুত করার কৌশল জানিতেন। ইহা নিক্ষেপ করিলে অবরোধ-দুর্গ ও যন্ত্রগুলি ভস্মীভূত হইয়া যাইত। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে পুরস্কার দানের প্রস্তাব করিলে এই মহাপ্রাণ শিল্পী উত্তর দিলেন, খোদার কাজের জন্য যাহা করিয়াছি তজ্জন্য আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারি না।" ইহাতে সালাহ্উদ্দীন আরও সন্তুষ্ট হইলেন। উত্তরাঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের দরুন মুসলিম শিবিরের দক্ষিণাংশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ইহা আক্রমণ করিতে গিয়া ২৫শে জুলাই ফ্র্যাঙ্কেরা আল্-আদিলের হস্তে গুরুতররূপে পরাজিত হইল। তাহাদের স্বীকৃতি মতেই এ দিন অন্ততঃ ৪০০০ সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ইহার দ্বিগুণেরও অধিক। খণ্ড-যুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিলেও স্থানান্তরে সৈন্য পাঠাইবার ফলে সালাহ্উদ্দীনের আর খৃস্টান শিবির আক্রমণ করার ক্ষমতা রহিল না। একবার শিক্ষা পাইয়া তাহারাও আবার সমুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইল না।

কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। এই যুদ্ধের দুইদিন পরে ক্যাম্পেনের হেন্‌রী ১০,০০০ ফরাসী সৈন্য, কয়েক হাজার নাইট, অভিজাত ও যুদ্ধোন্মত্ত পাদ্রী লইয়া একরে অবতরণ করিলেন। খৃস্টানদের সংখ্যা এখন এক লক্ষে দাঁড়াইল। বাধ্য হইয়া সালাহ্-উদ্দীন ১লা আগস্ট আবার পাহাড়ে সেনা সরাইয়া লইয়া গেলেন। ফলে একরের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইল। কবুতরের ডাক, সুদক্ষ সন্তরনকারী বা দ্রুতগামী ক্ষুদ্র তরণী ভিন্ন সংবাদ আদান-প্রদানের আর কোনই উপায় রহিল না। একদিন একখানা অর্ণবযান ফরাসী জাহাজের ছদ্মবেশে একরে প্রবেশ করিল। নগরে যখন একদিনেরও খাবার নাই, এমন সময় অনেক খাদ্যদ্রব্য লইয়া মিসর হইতে তিনখানা জাহাজ আসিল। মুহূর্ত-মধ্যে খৃস্টানদের দাঁড়টানা জাহাজগুলি উহাদের উপর আপতিত হইল। সৌভাগ্যবশতঃ বায়ু অনুকূল থাকায় ভীষণ যুদ্ধের পর মালবাহী-জাহাজগুলি শত্রুদের চীৎকার ও মুসলমানদের শুকরিয়া-ধ্বনির মধ্যে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিতে পারিল।

একবার বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিলে জাহাজ 'পতঙ্গ দুর্গে'র আশ্রয়ে নিরাপদ হইত। তজ্জন্য খৃীস্টানেরা উহা বিনষ্ট করিতে

বদ্ধ-পরিকর হইল। তাহাতে প্রস্তর নিক্ষেপ বা অগ্নি সংযোগের জন্য সুদক্ষ পিসাবাসীরা তাহাদের জাহাজের উপর একটি অত্যুচ্চ বুরুজ নির্মাণ করিল। মুসলিম নৌ-বহরে আগুন লাগাইবার জন্য একখানা দাহ্যপদার্থপূর্ণ জাহাজও পোতাশ্রয়ে প্রেরিত হইল। কিন্তু রক্ষী-সৈন্যেরা একযোগে বুরুজ আক্রমণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। শত্রুদের অনলবাহী পোতখানা প্রতিকূল বায়ুতে পথ-ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা উহাও ধরিয়া লইয়া গেল। অক্টোবরের প্রথমে সুয়েবিয়ার ডিউক ৫০০০ জার্মান সৈন্য লইয়া একরে আসিতেন। বার্বারোসা-নন্দনের উপস্থিতিতে খৃস্টান মহলে নতুন উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি কিছুতেই প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তৃপ্ত হইতে চাহিলেন না। সালাহ্উদ্দীনের অগ্রগামী প্রহরীরা তখনও আল-আদিয়ায় অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার আদেশে তেলকায়সান হইতে মসুল-বাহিনী আসিয়া তাহাদের সহিত একত্র হইল। তাহারা সহজেই ক্রুসেডারদিগকে তাড়াইয়া দিল। অতঃপর খৃস্টানেরা দুইটি নূতন অবরোধ-যন্ত্র নির্মাণ করিয়া আরও নিকটে গিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইলেও রক্ষী-সৈন্যেরা এবারও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ফ্র্যাঙ্কেদের সাধের যন্ত্র দুইটিও তাহারা বিজয় উল্লাসে নগরমধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

ইউরোপ হইতে অচিরে আরও সাহায্যকারী সৈন্য আসায় রক্ষী-সৈন্যদের আনন্দ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষাদে পরিণত হইল। কেন্টর-বারীর আর্চবিশপ বল্ডুইন, সেলিসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াল্টার ও প্রধান বিচারপতি রেনুল্ফ ডি গ্লানভাইল বহু ইংরেজ সৈন্য, অর্থ ও যুদ্ধোপকরণ সহ ১২ই অক্টোবর একরে উপস্থিত হইলেন। খৃস্টান শিবিরে তখনও সতীত্ব, মিতাচার বা দয়াধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। আগন্তুকেরা তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিতে না পারিলেও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে সমর্থ হইল। শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটায় ১২ই নভেম্বর তাহারা হেনরী ও কনরাডের নেতৃত্বে হায়ফা যাত্রা করিল। কিন্তু সেখানে খাদ্যদ্রব্য নাই শুনিয়া ১৪ই তারিখে তাহারা শিবিরে ফিরিয়া চলিল। এই উপলক্ষ্যে ১২ই নভেম্বর প্রাতে বসন্ত-শৃঙ্গে মুসলমানদের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। পরবর্তী দুই দিনেও খণ্ডযুদ্ধ চলিল। ফলাফল অমীমাংসিত হইলেও খৃস্টানদের

ক্ষতি কিছু বেশী হওয়ায় মুসলমানেরা তাহাদের শিবির আক্রমণ করিতে চাহিল। কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন আবার অসুস্থ হইয়া পড়ায় এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা ঘটিয়া উঠিল না।

যুদ্ধ বন্ধ থাকিলেও প্রকৃতির হস্তে খৃস্টানেরা কম নিগ্রহ ভোগ করিল না। অচিরে রাণী সিবিলা, গ্লানভাইল, ফেরার্সের আর্ল ও ক্লেয়ারের আর্লের ভ্রাতার মৃত্যু হইল। সিবিলার পুত্রদ্বয়েরও মৃত্যু হওয়ায় রাজা গাঈর স্বত্ব নষ্ট হইয়া গেল। ক্ষোভে-দুঃখে বৃদ্ধ আর্চবিশপও নভেম্বরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কৌশলে হাম্ফ্রে ও জেরুজালেমের রাজমুকুটের উত্তরাধিকারিণী ইসাবেলার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কন্‌রাড নিজে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর রাজ্যলাভের উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করার জন্য তিনি টায়ারে চলিয়া গেলেন। এদিকে খৃস্টান শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক বস্তা শস্য এক শত স্বর্ণমুদ্রায় ও একটি ডিম ছয় টাকায় বিক্রীত হইতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। ক্ষুধার তাড়নায় লোক অশ্ব-মাংস, মৃত পশুর নাড়ীভুঁড়ী, এমন কি তৃণ পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ প্রাণরক্ষার জন্য মুসলমান হইয়া গেল। খৃস্টানদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইলেও সালাহ্‌উদ্দীন তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা দেখাইলেন। কয়েকজন ফ্র্যাঙ্ক ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি রাজোচিত শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার দিয়া দামেশ্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। বস্তুত খৃস্টান শিবিরে শীতে কাঁপা ও অনাহারে ইহা বরণ অপেক্ষা সালাহ্‌উদ্দীনের অতিথি হওয়াও অনেক ভাল ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পেন্টেকস্‌ট পর্বের সময় একখানা শস্যপূর্ণ জাহাজ খৃস্টান শিবিরে হাজির হওয়ায় তাহারা আশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

নভেম্বরে মেসোপটেমিয়ার শাহজাদারা দেশে চলিয়া গেলেন। কেবল ব্যক্তিগত অনুচরেরাই সালাহ্‌উদ্দীনের নিকট রহিল। এই সময় তাঁহার প্রধান কাজ হইল নগরে খাদ্যাদি প্রেরণ করা। খৃস্টানদের বাধা উপেক্ষা করিয়া আল্-আদিল দুর্গে যথেষ্ট যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিলেন। ১১৯১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সালাহ্‌উদ্দীন একজন নূতন সেনাপতির অধীনে নগরে একদল নবীন ও

সতেজ সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু যত লোক ভিতরে প্রবেশ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক বাহির হইয়া আসিল। নবাগত সৈন্যেরা অবরোধের প্রতিরোধেও সুদক্ষ ছিল না। এইরূপ অযোগ্য লোকের হস্তে এইরূপ গুরুতর কার্যের ভারার্পণ করায় কেহ কেহ অবিবেচক বলিয়া সালাহ্উদ্দীন নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি তখনও রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবর্তনের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই।

বসন্তকালে বিবাদমান শক্তিদ্বয়ের অবস্থার বিশেষ রদবদল হইল না। রক্ষী-সৈন্যেরা আপাততঃ নিশ্চিন্ত, নগর খাদ্য-দ্রব্যে পূর্ণ, সালাহ্উদ্দীন গৃহ-গমনকারী সৈন্যগণের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় পাহাড়ে উপবিষ্ট। অপরদিকে দুর্বল, নিস্তেজ ও নীতিভ্রষ্ট হইলেও খৃস্টানদের পরিখা ও মৃন্ময়-প্রাচীর বেষ্টিত শিবির তখনও তাহাদের দখলে। গ্রীষ্মকালের আবির্ভাবের সহিত এই অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল। রিচার্ড ও ফিলিপের আগমনে মুসলমানেরা দেখিল, তাহারা আর অবরোধকারীদের অবরোধকারী নহে, বরং নিজেরাই শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত।

একরের পতন

রিচার্ড ও ফিলিপ ১১৯০ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালেই ১০০,০০০ সৈন্য লইয়া পুণ্যভূমির পুনরুদ্ধারে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহাদের অগ্রগতি প্রমোদ-পোতে সমুদ্র বিহারের ন্যায় মন্থর হইয়া দাঁড়াইল। রিচার্ড পথিমধ্যে সাইপ্রাস জয় করিয়া নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত এক মাস কাল মধু-যামিনী যাপন করিলেন। অনাহারে মরণোন্মুখ বাহিনীর মুক্তি সাধনের ইহা অতি চমৎকার উপায়, সন্দেহ নাই। ফ্র্যাঙ্কদের সৌভাগ্যবশতঃ ফিলিপ রিচার্ডের কার্যের সমর্থন করিতে না পারিয়া মে মাসে একরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খৃস্টানেরা যেন নব-জীবন লাভ করিল। নতুন উদ্যমে রাতদিন দুর্গ অবরোধ চলিতে লাগিল। এদিকে রিচার্ডও স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিডনের নিকটে প্রবীণ সৈন্য-পূর্ণ একখানা মুসলমান জাহাজ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর ইহা ধ্বংস করিয়া দিয়া ৮ই জুন শনিবার তিনি একরে হাজির হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া ক্রুসেডার মহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

এবার প্রবল উদ্যমে নগর আক্রমণ আরম্ভ হইল। ফিলিপের 'কু-প্রতিবেশী' নামক একটি অবরোধ-যন্ত্র ছিল। কিন্তু নাগরিকেরা 'কু-জ্ঞাতি' নামক আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেও রাজা তাঁহার প্রিয় যন্ত্রের পুনঃ পুনঃ সংস্কার সাধন করিয়া অবিশ্রান্ত আক্রমণে নগরের প্রধান প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ফ্ল্যাণ্ডার্সের কাউণ্টেরও একটি চমৎকার যন্ত্র ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা রিচার্ডের দখলে আসিল। সর্ব সাধারণের অর্থে 'ভগবানের ফিঙ্গা' নামে আর একটি যন্ত্র নির্মিত হইল। ইহাদের প্রস্তর-বৃষ্টির ফলে নগরের প্রধান দ্বার সব ভগ্ন হইয়া গেল। রিচার্ডের নিজেরও দুইটি উৎকৃষ্ট ফিঙ্গা ছিল। উহাদের একটি নগরের বাজারের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারিত। প্রাচীরে আরোহণ করার জন্য ফিলিপ 'বিড়াল' নামক একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। উহা বিড়ালের

ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া দেয়ালে উঠিয়া দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত ফিলিপ ও রিচার্ড প্রত্যেকেই একখানা চালা প্রস্তুত করেন। এগুলির নীচে বসিয়া তাঁহারা সৈনাদের উৎসাহ বর্ধন ও শরাঘাতে শত্রু নিধন করিতেন।

ক্রমাগত আক্রমণে নগর-প্রাচীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কেরা মৃত বা নিহত অশ্ব ও মৃতদেহে পরিখা পূর্ণ করিয়া রাখিত। রক্ষী-সৈন্যদিগকে প্রত্যহ এই আবর্জনা পরিষ্কার করিতে হইত। নিয়ত রাত্রি জাগরণে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশ্য সুলতান খৃস্টানদিগকে বাধাদানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিতেন না। আক্রান্ত হইলেই নাগরিকেরা ঢোল বাজাইত। সঙ্গে সঙ্গেই সালাহ্উদ্দীন খাত-বপ্র-বেষ্টিত খৃস্টান শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস পাইতেন। ১৪ই ও ১৭ই জুন তারিখে এরূপ আক্রমণের কথা জানা যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে উভয় পক্ষ স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। ২রা ও ৩রা জুলাই তারিখে আবার ভীষণতরভাবে খৃস্টান শিবির আক্রান্ত হইল। হাতাহাতি যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল। কিন্তু জগতের সর্বদেশের অসংখ্য খৃস্টান একরে সমবেত হইয়াছিল। সালাহ্উদ্দীন কত মারিবেন? তাহাদের একাংশ মাত্র তাঁহাকে বাধা দিতে আসিত। অপরাংশ নিরুদ্বেগে অবরোধ চালাইত। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান নরপতিই সালাহ্উদ্দীনের সাহায্যে আসেন নাই। মরক্কোর আল্-মুওয়াহ্হিদ খলীফার নিকট দূত পাঠাইয়াও কোন সাড়া পান নাই। তাঁহার নিজের সৈন্যেরাও বৎসরের অর্ধেক কাল গর্হাজির থাকিত। অসন্তুষ্ট জঙ্গী-বংশীয় শাহ্জাদাদের নিকট তিনি আর কতই প্রভুভক্তির দাবী করিতে পারিতেন? তাঁহার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর। বিগত দুই বৎসরের অবিরত পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যে কোন সৈন্য অপেক্ষা তিনি অধিক পরিশ্রম করিতেন। প্রত্যহ গুরুভার বর্ম পরিধান করিয়া তাঁহাকে সেনাদলের নিবিড়তম অংশে অবস্থান করিতে হইত। অনেক সময় উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের চিন্তা করার অবসরও তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। কাজেই তাঁহার ব্যর্থতায় বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই।

ওরা জুলাই ফরাসী-রাজের খনকেরা ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন করিতে করিতে প্রাচীর-নিম্নে উপনীত হইল। তাহারা উহা কাষ্ঠ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। ফলে প্রাচীরের এক বৃহদাংশ নড়িয়া উঠিল। কিন্তু সটান ভূ-পতিত না হইয়া ক্রম-নিম্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। খৃস্টানেরা নগরে প্রবেশের আশায় সেখানে ছুটিয়া আসিল। তুর্কীরাও তাহাদিগকে বাধাদানের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। আল-আদিল একে একে দুইবার খৃস্টানদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাকিউদ্দীনের সৈন্যরা প্রাণপণ পরিশ্রমে খাত পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু দুর্ভেদ্য শত্রু-সৈন্য-প্রাচীর ভেদ করিয়া সমুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। রক্ষী-সৈন্যদের দুঃখে সালাহ্‌উদ্দীনের চোখে পানি আসিল। ঔষধ ব্যতীত সেদিন তিনি আর কোনই খাদ্য গ্রহণ করিলেন না।

ক্রমাগত আক্রমণের ফলে অবশেষে নগরের পতনকাল ঘনাইয়া আসিল। রিচার্ড ধনুর্বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার শরাঘাতে বহু রক্ষী-সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল। খননকারীরা সুড়ঙ্গ খনন করিতে করিতে দুর্গের ভিত্তিমূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুড়ঙ্গ কাষ্ঠ-পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে প্রাচীরের একাংশ সটান ভূ-পতিত হইল। খৃস্টানেরা জল-স্রোতের ন্যায় সেদিকে ধাবিত হইল। তুর্কীরাও সেখানে দৌড়াইয়া আসিল। কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের পর খৃস্টানেরা পিছু হটিতে বাধ্য হইল। অতঃপর পিসাবাসীরা বহু কষ্টে দুর্গে আরোহণ করিল। কিন্তু রক্ষীসৈন্যেরা তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিল। 'রিচার্ডের ভ্রমণবৃত্তান্ত' লেখক বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ কখনও কোন জাতি এই তুর্কীদের ন্যায় এমন রণ-নৈপুণ্য দেখাইতে পারে নাই। কোন ধর্মাবলম্বী কোন জাতির যোদ্ধাই আত্মরক্ষা বা আক্রমণে তাহাদের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারিতনা। সাহস ও পূর্ণ সাধুতার জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিতেই হইবে। 'সত্য ধর্মাবলম্বী' হইলে তাহাদের অপেক্ষা ভাল লোক পৃথিবীতে পাওয়া যাইত না।"*

একরের প্রাচীর আংশিক পতিত এবং উহার অধিকাংশ অধিবাসী নিহত হইলেও নগরে তখনও ৬০০০ লোক ছিল। যে লৌহ-অঙ্গুরীয়ক

* Chronicles of the Crusades, 212.

তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভগ্ন করা সালাহ্উদ্দীনের সাধ্যাতীত বুঝিতে পারিয়া নাগরিকদের নৈরাশ্যের সীমা রহিল না। তিন জন নেতৃস্থানীয় আমীর রাত্রিকালে ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিলেন। ফলে অন্যান্য লোক ভয়াভিভূত হইয়া পড়িল। কেহ পলাতক আমীরদের পদাঙ্কানুসরণ করিল, কেহ বা খৃস্টান শিবিরে পলাইয়া গিয়া ধর্মান্তর গ্রহণের প্রার্থনা জানাইল। অবশিষ্ট লোকের উপদেশে শাসনকর্তা কারাকুশ ও প্রধান সেনাপতি আল্ মেস্তব ৪ঠা জুলাই শত্রুশিবিরে গিয়া প্রস্তাব করিলেন, সুলতানের নিকট হইতে সহসা সাহায্য না আসিলে এবং যাবতীয় অবরুদ্ধ নাগরিককে অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি সহ নগর ত্যাগের অনুমতি দিলে তাঁহারা আত্ম-সমর্পণে প্রস্তুত আছেন। ফরাসীদের অধিকাংশই ইহাতে সম্মত হইল। কিন্তু রিচার্ড শূন্য নগরে প্রবেশ করিতে রাজী হইলেন না। কাজেই সন্ধির আলোচনা ফাঁসিয়া গেল। অবশ্য সালাহউদ্দীনের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে আরও কিছুকাল আত্মরক্ষা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া শীঘ্রই সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সিঞ্জার ও মিসর বাহিনী ইতিপূর্বেই গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। ৯ই জুলাই সিঞ্জারের শাহ্জাদা সালাহ্-উদ্দীনের কদমবুচি করিলেন। পরদিন দোলদেরিমের অধীনে একদল বেতনভোগী অশ্বারোহী সৈন্য আসিল। কিন্তু তাহারা শত্রুদের পরিখা ও দুর্ভেদ্য মৃন্ময় প্রাচীরের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই চতুর্দিকে এক অজেয় বিরাট বাহিনী থাকিতেও হতাবশিষ্ট রক্ষী-সৈন্যেরা সাহায্যলাভে নিরাশ হইয়া ১১ই জুলাই আত্ম-সমর্পণ করিল।

"ন্যায়-পরায়ণতা ও অদ্ভুত সাহসের জন্য তুর্কীরা এত অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, নগর ত্যাগের পূর্বে খৃস্টানেরা অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত নির্নিমেষ চোখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা শত্রুদের দয়া ভিক্ষা করিয়াছিল। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিলেও তাহাদের ধীর-স্থির মুখাবয়ব ও নির্বিকার আকৃতি লক্ষ্য করিয়া খৃস্টানেরা বিস্মিত হইয়া গেল।" এইরূপে পঞ্চমুখে তুর্কীদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক বলেন, "সমস্ত তুর্কী নগরের বাহিরে চলিয়া গেলে খৃস্টানেরা ইশ্বরের গুণগান করিতে করিতে সেখানে প্রবেশ করিল।" তুর্কীরা যে এই

প্রশংসার সম্পূর্ণ অধিকারী তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু 'সমস্ত তুর্কীর একর পরিত্যাগে'র ন্যায় নির্জলা মিথ্যা কথাও আর নাই। একরের অধিকাংশ লোককেই সন্ধি-শর্তের জামীনরূপে বন্দী করিয়া রাখা হয়। খৃস্টান ঐতিহাসিক আরনল্ড পর্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যে হত্যাকাণ্ডের ভয়ে নাগরিকেরা তাহাদের প্রভুর অজ্ঞাতে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করে, পরিণামে তাহারা উহা এড়াইতে পারে নাই। তদুপরি তাহাদিগকে কিছুদিন কারা-ক্লেশও ভোগ করিতে হয়। 'বোঝার উপর শাকের আটি' আর কি! সালাহ্‌উদ্দীনের ন্যায় মহামতি লোকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলে তাহারা সম্মানের সহিত নগর ত্যাগ করিতে পারিত। কিন্তু 'সিংহ-প্রাণ' রিচার্ডের নিকট এরূপ দয়ার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

খৃস্টানদের নগর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় নাগরিক শৃঙ্খলা-বদ্ধ হইল। "তাহাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পত্তি রাজদ্বয় আপনাদের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া লইলেন। বন্দীদিগকেও দুই ভাগ করিয়া অর্ধেক রিচার্ড ও ফরাসীরাজ অপরার্ধ গ্রহণ করিলেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কারাকুশ ফিলিপের ও মেস্তব রিচার্ডের ভাগে পড়িল। ফ্রান্সরাজ টেম্পলারদের প্রাসাদ ও ইংল্যাণ্ড-রাজ তুর্কী-প্রাসাদ অধিকার করিলেন। .. নগরের অন্যান্য গৃহ সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ-যন্ত্রণা ভোগের পর বিশ্রাম লাভের অবকাশ পাইয়া তাহারা আনন্দোৎসবে মত্ত হইল।"

রিচার্ড ও বার্গাণ্ডীর ডিউকের বর্বরতা

একরের আত্ম-সমর্পণে সালাহ্‌উদ্দীন নির্বাক হইয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, নগর দীর্ঘকাল আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না। তাঁহার সৈন্যদলও শত্রুদের পরিখা ও মৃন্ময়-প্রাচীর বেষ্টিত শিবির ভেদ করিয়া নাগরিকদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না। খৃস্টানেরা যে সমুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। যতদিন পর্যন্ত তাঁহাকে প্যালেস্টাইনের ফ্র্যাঙ্কদের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত তিনি কখনও সন্ধির কল্পনাও করেন নাই। কিন্তু ইউরোপীয় আগমনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। কাজেই রিচার্ড যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তির প্রস্তাব উঠাইলেন, তখন তিনি তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। পুণ্যভূমিতে পদার্পণের পরেই ইংল্যাণ্ড-রাজ জ্বরে আক্রান্ত হন। সন্ধির প্রস্তাব ইহারই পরিণাম।

রিচার্ড প্রথমে সালাহ্‌উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানাইলেন। সুলতান অস্বীকৃত হওয়ায় আল্-আদিলের সহিত তাঁহার আলোচনার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রিচার্ড সুলতানকে কয়েকটি বাজ পাখী পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি কুক্কুট চাহিয়া লইলেন। ১লা জুলাই সালাহ্‌উদ্দীন স্বয়ং দোভাষীর মারফতে খৃস্টান দূতদের সহিত সন্ধির কথা আলোচনা করিলেন। শান্তি স্থাপনে ব্যগ্রতা দেখাইবার জন্য খৃস্টানেরা পরবর্তী তিন দিন নগর আক্রমণ পর্যন্ত বন্ধ রাখিল। ৪ঠা তারিখে রাজদূতেরা আবার আসিয়া কিছু বরফ ও ফল লইয়া গেলেন। ৬ই জুলাইর মধ্যে আরও দুইবার দূত আসিল। কিন্তু এই সকল সাক্ষাৎকারে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের দুর্বলতা আবিষ্কার করা। কাজেই আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইল না।

মুসলমানদের অধীন সমস্ত খৃস্টান কয়েদীর মুক্তিদান ও উপকূলের সমুদয় নগর প্রত্যর্পণ করার জন্য খৃস্টানেরা সুলতানকে চাপিয়া ধরিল। তিনি তাহাদিগকে 'প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ' ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি

সহ একর নগর ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু খৃস্টানেরা তাহাতে রাজী হইল না। ৭ই জুলাই একজন লোক সাঁতার কাটিয়া আসিয়া সালাহ্‌উদ্দীনকে বলিল, নাগরিকেরা শেষ পর্যন্ত আত্ম-রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ১২ই জুলাই সেই লোকটি আবার আসিয়া সংবাদ দিল, রক্ষী-সৈন্যেরা নিম্নলিখিত শর্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে ঃ— (১) যাবতীয় ধন সম্পত্তি, অর্ণবযান ও যুদ্ধোপকরণাদি সহ একর নগর ছাড়িয়া দিতে হইবে; (২) ফ্রাঙ্কেরা দুইলক্ষ ও কন্‌রাড্ চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ পাইবেন; (৩) প্রকৃত ক্রুশ কাষ্ঠ প্রত্যার্পণ করিতে এবং ১৫০০ সাধারণ ও ২০০ পদস্থ খৃস্টান বন্দীকে মুক্তিদান করিতে হইবে। এই সকল শর্ত প্রতিপালন করিলে নাগরিকেরা বহনোপযোগী দ্রব্যাদি সহ নগর ত্যাগ করিতে পারিবে।

সালাহ্‌উদ্দীনের অধীনে তখনও এক পরাক্রান্ত বাহিনী ছিল। কিন্তু চৌদ্দ বৎসর পূর্বে খৃস্টানদের অতর্কিত আক্রমণে রমলার রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়নের পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটি যুদ্ধেও তাহারা পরাজিত হয় নাই। কাজেই এই সকল শর্তে তাঁহার ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়ারই কথা। তথাপি তাঁহারই কর্মচারীরা ইহা স্থির করায় তিনি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিলেন না। নগর পাহারা দেওয়ার আর কোন দরকার ছিল না বলিয়া মুসলমানেরা সাফ্রামে সরিয়া গেল। বন্দীদের হিসাব প্রস্তুত করার জন্য একমাস পর্যন্ত প্রতিনিধিরা উভয় শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করিলেন। কিন্তু বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মনে প্রকৃত সদ্ভাব ছিল না। এমন কি একরে একটি নিয়মিত যুদ্ধেরও প্রশ্রয় দান করা হইল। তাহাতে ফ্র্যাঙ্কদেরই পরাজয় ঘটিল।

ইতিমধ্যে ফরাসী-রাজ রূপে আক্রান্ত হইয়া স্বদেশ গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তুর্কী নিধন করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হওয়ায় তিনি তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বার্গাণ্ডীর ডিউকের অধীনে পুণ্যভূমিতে রাখিয়া গেলেন। রিচার্ড কনরাডকে জেরুজালেমের সিংহাসন লাভে সহায়তা না করায় ১লা আগষ্ট তিনিও টায়ারে চলিয়া গেলেন।

সালাহ্‌উদ্দীন সন্ধি-নির্দিষ্ট বন্দী ও অর্থ এক মাস পর পর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ করার প্রস্তাব করিলেন। ২রা আগষ্ট তাহাতে রিচার্ডের সম্মতি মিলিল। প্রথম মাসের শেষে প্রথম কিস্তি প্রস্তুত রাখা হইল। ফ্র্যাঙ্কেরা বলিল, কয়েক জন নির্দিষ্ট বন্দীকে

নাম তালিকায় পাওয়া যায় না। ১১ই তারিখে তাহারা পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করিতে আসিল। সালাহ্উদ্দীন সরল ভাবে বলিলেন, "এই কিস্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া দাও ; বাকী কিস্তির জন্য তোমাদিগকে জামীন দেওয়া যাইতেছে।" খৃস্টানেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমাদের ষোল আনা প্রাপ্য পাইলে আপনার লোকজন অবশ্যই ছাড়িয়া দিব। খৃস্টানদের প্রতিজ্ঞার মূল্য সালাহ্উদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই তিনি ইহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। তাঁহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত হইলেও ক্রুসেডার মহলে ইহা ফাঁকি দানের চেষ্টা বলিয়া বিবেচিত হইল। রিচার্ড চটিয়া গিয়া যে পাশব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরতরে কলঙ্কিত হইয়া রহিল।

রিচার্ডের প্রশংসাকারী লেখকের ভাষায় তিনি ১৬ই (মতান্তরে ২০শে আগষ্ট শুক্রবার ২৭০০ তুর্কী জামীনদারকে নগরের বাহিরে নিয়া শিরোচ্ছেদের আদেশ দিলেন। রাজানুচরেরা বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া প্রভুর আদেশ পালনের জন্য লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইল। প্রতিশোধ গ্রহণের এমন অপূর্ব সুযোগ পাইয়া তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। * একরের সমুখে মুসলমানদের একটি বহিঃসেনানিবাস ছিল। তাহাদের স্বদেশী ও স্বধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণকে তাহাদেরই চোখের উপর এইভাবে কসাইর ন্যায় হত্যা করিতে দেখিয়া তাহারা এই নির্মম পৈশাচিক কার্যে বাধাদানের জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও তাহারা হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃদ্ধ, দুর্বল, এমন কি রমণী ও বালক-বালিকারাও নিষ্ঠুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। কেবল প্রতিপত্তিশালী বা কঠোরশ্রমী ব্যক্তিরাই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইল। 'মড়ার উপড় খাঁড়ার ঘা।' খৃস্টানদের বিশ্বাস ছিল, মুসলমানেরা স্বর্ণ-রৌপ্য গলাধঃকরণ করিয়া রাখে। এই লুক্কায়িত অর্থ বাহির করার জন্য তাহারা নিহত বন্দীদের দেহগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিল। বার্গাণ্ডীর ডিউকও পশ্চাদ্বর্তী হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনিও এই সময় একরের প্রাচীরের উপর প্রায় সম-সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করিলেন। এইরূপে খৃস্টানদের

* Cronicles of the Crusades, 222.

বর্বরতায় সর্বশুদ্ধ ৫০০০ মুসলমান নিহত হইল।*

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অহেতুক হত্যাকাণ্ডের তুলনা অতি বিরল। ষ্টেনলি লেনপুল বলেন, এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের সমর্থন বা দোষস্খালনের জন্য কোনই ওজরের কল্পনা করা যায় না। সালাহ্‌উদ্দীনের প্রায় অসঙ্গত শৌর্য্যপূর্ণ সদয় ও সদাশয় কার্যাবলীর পর ইংল্যাণ্ডাধিপতি ও ফরাসী রাজপ্রতিনিধির নিষ্ঠুরতা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধে মুসলমানেরাই যে সুসভ্যতা', সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা, মার্জিত আচার প্রভৃতি যাবতীয় সদ গুণের অধীকারী ছিল ক্রুসেডের পাঠকগণকে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।* আশ্চর্য্যের বিষয়, এই হত্যাকাণ্ডের নায়কেরও সমর্থকের অভাব হয় নাই। আর্চার ও কিংসফোর্ড বলেন, এত বন্দী সঙ্গে নেওয়া হয়ত রিচার্ডের নিকট সহজ ও নিরাপদ মনে হয় নাই। কি চমৎকার যুক্তি !! রিচার্ড-পূজকেরা তাঁহার বর্বরতার সমর্থনের একটি ন্যূনতর ঘৃণিত ওজরের সন্ধান পাইলে হয়ত আরও সন্তুষ্ট হইবেন। রগার হুভেডনের মতে এই হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পূর্বে সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার খৃস্টান বন্দি-গণকে নিহত করেন। কিন্তু মুসলমান অ-মুসলমান আর কোন লেখকের গ্রন্থেই এই মিথ্যা উক্তি সমর্থনের জন্য একটি অক্ষর ও পাওয়া যায় না। অধ্যাপক গিবন রিচার্ডকে ন্যায়তঃ 'শোণিতপিপাসু" আখ্যা দিয়াছেন। * কক্স বার্ট বলেন, "অপরাধী হিসাবে তাঁহাকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করা যায়। গথ আলারিক বা হুন এটিলা কখনও নিজেদেরকে সভ্যজাতির রাজা বলিয়া প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু কোন অর্থেই 'মানব জাতির চাবুক' আখ্যা লাভে রিচার্ড অপেক্ষা তাঁহাদের অধিক দাবী নাই।"*

---

* Cox, Bort, 127, Archer and Kingsford, 331,

* "...there is no imaginable excuse or palliation for the cruel and cowardly massaere After Saladin's almost quixotic acts of clemency and generosity the king of England's cruelty will appear amazing. But the students of the Crusades do not need be told that in this struggle the virtues of civilization, magnanimity, toleration, real chivalry, and gentle culture were all on the side of the Saracens."—Lane-poole 306 7.

* "Sanguinary Richard."—Gibbon, VI, 379.

* "...Richard I.. may fairly compete with him (Napoleon) as a criminal. Alaric the Goth and Attila the Hun never professed to be sovereigns of a civil sed people, but in no sense have they a better title to be regared as scourges of mankind."—Cox, Bort, 111.

আর্সাফের যুদ্ধ

একরের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের পর রিচার্ড জেরুজালেম গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ক্রুসেডারেরা তখন আলস্য ও ভোগবিলাস পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন। উৎকৃষ্ট মদ্য ও সুন্দরী ললনাপূর্ণ এমন আরামপ্রদ নগর ত্যাগে তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেকে একেবারে লম্পট হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অবিশ্রান্ত পাপাচারে সমগ্র নগর ধর্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নারী না পাইলে তাহারা স্থানান্তরে গমন করিবে না বুঝিতে পারিয়া রিচার্ড সমস্ত রমণীকে তাহাদের অনুসরণ করার আদেশ দান করিলেন। রজকীদের সহিত ব্যভিচার করা নিষিদ্ধ বলিয়া কেবল তাহারাই এই আদেশ হইতে রেহাই পাইল। এবার ক্রুসেডারেরা বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এক লক্ষ লোক রিচার্ডের অনুগমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

একর হইতে একটি রাজপথ সাফ্রাম পাহাড়ের ভিতর দিয়া জেরুজালেমের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। সালাহ্উদ্দীন পূর্বেই উহা বন্ধ করিয়া রাখায় রিচার্ড সমুদ্র-তীরের প্রাচীন রোমান রাস্তা অবলম্বন করিয়া আস্কালনের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সহসা জেরুজালেম আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই পথ কিঞ্চিদধিক ষাট মাইল দীর্ঘ। ইহাতে আটটি নদী ও বহু বন-জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইত। বাম পার্শ্বের ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি হইতে মুসলমানেরাও তাঁহাকে অবিরত উত্যক্ত করিতে পারিত। তবে দক্ষিণ দিকে সমুদ্র থাকায় তিনি নৌবহরের সাহায্য পাইতে পারিতেন। ২১শে আগস্ট খৃস্টানেরা শিবির ভাঙ্গিয়া বেলুস নদী অতিক্রম করিল। পরদিন তাহারা কিশন নদী উত্তীর্ণ হইয়া হায়ফায় তাঁবু গাড়িল। খৃস্টানদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সালাহ্উদ্দীনও সসৈন্যে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আমীর জুর্দিকের অধীনে একদল সৈন্য রাখিয়া তিনি একটি যুদ্ধোপযোগী স্থানের অনুসন্ধানে সিজারিয়ার (কায়সারিয়া) দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩০শে আগষ্ট শত্রুরা সিজারিয়ার নিকটবর্তী হইল। সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার সৈন্যগণকে তৎক্ষণাৎ পথিপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ধনুর্ধরেরা পুরু ও দৃঢ় পরিচ্ছদ পরিহিত খৃস্টান সৈন্যদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। নাইটদিগকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া পদাতিকেরা শৃঙ্খলার সহিত সমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমানেরা তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য প্রলুব্ধ করিলেও তাহারা আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল। কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ইহা মুসলমানদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মুহূর্ত মধ্যে তাহারা ভারবাহী ঘোটক ও শকটশ্রেণীর উপর আক্রমণ করিল। অসতর্ক লোক ও অশ্বগুলি নিহত ও অধিকাংশ দ্রব্য লুণ্ঠিত হইল। বাধাদানকারীদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহারা পলাতকদিগকে সমুদ্র পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেল। অবশেষে রিচার্ড স্বয়ং বিপন্ন সৈন্যদের উদ্ধারে আসিলে তাহারা পর্বত শিখরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল।

এই সময় প্রখর গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড উত্তাপে উভয় পক্ষই ভীষণ কষ্টভোগ করিল। ফ্র্যাঙ্কদের দুর্দশা একেবারে চরমে উঠিল। অনভ্যাসের দরুণ তাহাদের বারংবার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। অনেকেই সর্দি-গর্মিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। সালাহ্‌উদ্দীন নিয়মিত যুদ্ধের জন্য আর্সাফের নিকটে একটি সুন্দর স্থান মনোনীত করিলেন। তিন লক্ষ সৈন্য তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে শুনিয়া ফ্র্যাঙ্কেরা সাহস হারাইয়া ফেলিল। ৫ই সেপ্টেম্বর রিচার্ড সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি সমগ্র প্যালেস্টাইন দাবী করায় আল-আদিল অবজ্ঞাভরে সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কাজেই অস্ত্রবলে ভাগ্য নির্ণয় করা ভিন্ন মীমাংসার আর কোন উপায় রহিল না। সালাহ্‌উদ্দীন নহ্‌রুল ফালেক বা ফাটাল নদী ও আর্সাফের মধ্যবর্তী মেষ-চারণ ভূমিতে স্থান গ্রহণ করিলেন। খৃস্টানেরা রমজানের জলাভূমির নিকট একদিন বিশ্রাম করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর ছয় মাইল দূরস্থ আর্সাফের দিকে অগ্রসর হইল।

বেলা তিন ঘটিকার সময় ত্রিশ হাজার তুর্কী সৈন্য খৃস্টানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের পশ্চাতে কাফ্রী ও বেদুইন পদাতিকেরা ঢাল ও ধনুক লইয়া ছুটিয়া আসিল। তৎপরে বিশ হাজার অশ্বারোহী বজ্রনাদে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইল। বহু সৈন্য ও অশ্ব তুর্কীদের

হস্তে নিহত হইলেও ফ্র্যাঙ্ক ধনুর্ধরেরা পরিশেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু তুর্কীরা অল্পক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। হস্‌পিটালারদের পদাতিক বাহিনী তাহাদের হাতে প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রিচার্ড তথাপি নাইট-দিগকে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দান করিলেন না। কিন্তু আর্সাফের অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আর যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল। কোন দল দক্ষিণ পার্শ্ব, কোন দল বাম পার্শ্ব, কোন দল বা কেন্দ্রভাগ আক্রমণ করিল। একসঙ্গে সর্বদল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মুসলমানেরা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে তাহারা চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল সালাহ্‌উদ্দীন মাত্র সতর জন সৈনিক লইয়া পতাকার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার আহবানে পলায়মান সৈন্যেরা একে একে তিনবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেরা প্রতিবারই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। মুসলমানেরা পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাহারা আর্সাফে উপস্থিত হইয়া শহরের নিম্নে শিবির সন্নিবেশ করিল।

আর্সাফে খৃস্টানদের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তদুপরি বহু তুর্ক সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল। এই ভাগ্য-বিবর্তনে সালাহ্‌উদ্দীন এতই মর্মাহত হইলেন যে, বাহাউদ্দীনের সান্ত্বনা বাক্যেও তিনি প্রবোধ পাইলেন না। অশ্বহীন সৈন্যদিগকে নিজের অশ্ব ও আহতদের শুশ্রূষার জন্য স্বীয় শিবির দান করিয়া পরদুঃখকাতর সুলতান একখণ্ড বস্ত্রচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালের মধ্যেই তাঁহার ক্ষণিকের অবসাদ চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে বাহির হইলেন। যথাবিধানে সৈন্য স্থাপন করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন সারাদিন আর্সাফে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেরা কিছুতেই নড়িল না। সোমবারে তিনি তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধার্থ আহবান করিলেন। ফ্র্যাঙ্কেরা এবারও অটল রহিল। অবশেষে তাহারা সমুখে অগ্রসর হইয়া জাফ্‌ফার প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে অসমর্থ হইয়া সালাহ্‌উদ্দীন জেরুজালেমের পথ দখলে রাখার জন্য তাঁহার সৈন্য-গণকে বার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রমলায় সরাইয়া লইয়া গেলেন।

'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখকের মতে আর্সাফে তুর্কীদের ৭০০০ সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু খৃস্টানদের ইহার দশমাংশ, এমন কি শতাংশও নিহত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তবে তাহারা পরাজিত শত্রুর পুনঃ পুনঃ আহ্‌বান সত্ত্বেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে প্রাচীরের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন; উত্তর অতি স্পষ্ট। যুদ্ধে বিপুল লোকক্ষয় হয় বলিয়াই তাহারা কৃতকার্যতার অনুসরণ করিতে পারে নাই। কুর্দ মুসেক ব্যতীত কোন প্রথম শ্রেণীর আমীর নিহত হন নাই। কিন্তু এভেন্‌সের নির্ভীক নাইট জেম্‌সের মৃত্যুতে খৃস্টানেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই আর্সাফের যুদ্ধ একেবারে নিরর্থক হয় নাই। সেই জন্য পরাজিত হইলেও শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয় সালাহ্‌উদ্দীনের এক বিরাট বিজয়।

সন্ধির উদ্যোগ

আর্সাফের যুদ্ধের পর খৃস্টানেরা যে জাফ্ফার প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় লইল, সালাহ্উদ্দীনের বারংবার 'যুদ্ধংদেহি' রবেও দুই মাসের মধ্যে তাহারা আর বাহিরে আসিল না। মৃত অশ্ব ভোজনের পর এস্থানের সুমিষ্ট ফল তাহাদের মনে ভারি স্ফূর্তির সঞ্চার করিল। একর হইতে আগত রমণীরা পাপের উৎস হইল। কেহ কেহ সেখানে ফিরিয়া গিয়া গণিকালয়ে আরামে কাল কাটাইতে লাগিল। জেরুজালেম উদ্ধারের মতলব 'মাঠে মারা' যায় দেখিয়া রিচার্ড রাজা গাঈকে একরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে ফল না হওয়ায় তিনি নিজে সেখানে গিয়া এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় হৃষ্পট সৈন্যদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিলেন। এইরূপ যোগাড়-যন্ত্রের ফলে সৈন্যসংখ্যা পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু জাফ্ফার দৃঢ়তা বর্ধন ও লিদ্যার পথে-প্রান্তরে দুই-তিনটি সুরক্ষিত স্থানের সংস্কার সাধন ব্যতীত নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বিরাট সেনাদল কিছুই করিল না। বরং দুঃসাহসিক কার্যের সন্ধানে গিয়া রিচার্ড নিজে প্রাণে মরিতে বসিলেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া তিনি পথিমধ্যে নিদ্রিত হইলে তুর্কীরা তাঁহার উপর আপতিত হইল। তাহারা নিশ্চিতই তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত, কেবল উইলিয়াম ডি প্রেয়াক্স নামক এক ব্যক্তির আত্মত্যাগের ফলে সে যাত্রায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল। এই লোকটি আরবী ভাষায় নিজেকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় নিঃসন্দিগ্ধ শত্রুরা রিচার্ডকে ছাড়িয়া তাঁহাকেই বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই সুযোগে প্রকৃত রাজা তাহাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

খৃস্টানদের এবংবিধ নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ সন্ধি-সূত্রে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা। আর্সাফের ক্ষতি সত্ত্বেও সালাহ্উদ্দীনের শক্তি অটুট ছিল। তাঁহার সৈন্যেরা জেরুজালেমের রাস্তা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। আত্মরক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বনেও তিনি শৈথিল্য দেখাইলেন না। খৃস্টানেরা যাহাতে সুরক্ষিত ও সুসমৃদ্ধ আস্কালন নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে, তজ্জন্য সালাহ্উদ্দীন রমলায় প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত

পরেই উহা ভূমিসাৎ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সর্বসাধারণের করুণ বিলাপের মধ্যে নগর ধ্বংস করিতে এক মাস লাগিল। নিরাশ্রয় অধিবাসীরা মিসর ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইল। নৈসর্গিক অবস্থানের দরুন আস্কালনের গুরুত্ব খুব বেশী। একদিকে ইহা মিসর সীমান্তের নিকটে একটি বৃহৎ বন্দর, অন্যদিকে জল ও স্থল পথে দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের একটি শক্তিশালী কর্মকেন্দ্র। সুতরাং ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ পূর্বাহ্নেই ইহার ধ্বংস সাধন সালাহ্উদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির একটা উজ্জ্বল প্রমাণ। ভূমিসাৎ করার পরেও ইহার পুনরাধিকার লাভের জন্য রিচার্ড যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাহা হইতেই সুলতানের অনুসৃত নীতির গুরুত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আস্কালনের ভূমিসাৎ-বার্তা জাফ্ফায় পৌঁছিবার পূর্বেই রিচার্ড আবার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আর্সাফের যুদ্ধের পর এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তোরণের হামফ্রে এই উদ্দেশ্যে লিদ্যায় আল্-আদিলের নিকট প্রেরিত হইলেন। যুদ্ধ বন্ধের জন্য দুই পক্ষই তুল্য ব্যগ্র হইলেও আল্-আদিল অধিকতর স্থির-প্রকৃতির রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন। যাহাতে অন্ততঃ আস্কালন ভূমিসাৎ করার সময় পাওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি কৌশলে সময় ক্ষেপণে মনস্থ করিলেন। এই সময় সন্ধি-রঙ্গ-মঞ্চে একজন নূতন নায়কের আবির্ভাবে তাঁহার খুবই সুবিধা হইল। ৩-রা অক্টোবর কন্রাড পৃথকভাবে সন্ধির প্রস্তাব তুলিলেন। তাঁহাকে সিডন ও বৈরুত ছাড়িয়া দিলে তিনি ক্রুসেডারদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সুলতানকে একর পুনরধিকার করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া রিচার্ড সন্ধি স্থাপনে আরও ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি আল্-আদিলকে 'প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাড়াতাড়ি বিবাদ মিটাইয়া ফেলার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি জেরুজালেম, প্রকৃত ক্রুশকাষ্ঠ ও জর্ডন নদীর অপর তীর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্য দাবী করায় সালাহ্উদ্দীন তাহাতে রাজী না হওয়ায় সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত কিছুই স্থির হইল না।

সুলতানের দৃঢ়তায় রিচার্ডের সুর নামিয়া আসিল। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। আল্-আদিল তাঁহার বিধবা ভগিনী সিসিলীর রাণী যোয়ানকে বিবাহ

করিবেন ; তিনি জাফ্‌ফা, আস্কালন ও সমুদ্রতীরস্থ নগরাবলী রিচার্ডের নিকট হইতে যৌতুক পাইবেন। সালাহ্‌উদ্দীন যে সকল স্থানে ইতিপূর্বেই জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা ছাড়া প্যালেস্টাইনের অবশিষ্ট অংশ তিনি নব-বিবাহিত দম্পতিকে উপহার দিবেন। তাঁহারা জেরুজালেমে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবেন। এই ব্যবস্থা আল্‌-আদিলের মনঃপূত হইল। ভাবী শ্যালক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া বিপুল ব্যয়ে তাঁহাকে রাজকীয় ভোজে আপ্যায়িত করিলেন। কিন্তু সালাহউদ্দীনের নিকট ইহা রিচার্ডের দুষ্ট কৌতুক বলিয়া মনে হইল। তথাপি তিনি এক পরামর্শ-সভা ডাকিয়া কনরাডের প্রস্তাবের সহিত ইহাও আমীরদের নিকট পেশ করিলেন। ফরাসীদের প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে রিচার্ডের সহিত সন্ধি করাই সাব্যস্ত হইল। কাজেই তাঁহার প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই শীতকাল উপস্থিত হওয়ায় আলোচনায় বাধা পড়িল।

বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়া মাত্রই সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার সেনাদলকে রমলা ও লিদ্যা হইতে জেরুজালেমে সরাইয়া লইয়া গেলেন। কর্দমের শক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় দূরবর্তী স্থানের সৈন্যেরা গৃহ-গমনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রিচার্ডের তখনও ইহা শিক্ষার বাকী ছিল। ডিসেম্বরে খৃস্টানেরা জেরুজালেম যাত্রা করিল। এগার মাইল দূরবর্তী রমলায় গমন করিয়া তাহারা দেড় মাস কাল সেখানে বসিয়া রহিল। এই সময় সালাহ্‌উদ্দীনের বহিঃসেনানিবাস হইতে তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিল। অতঃপর তাহারা সাহস সংগ্রহ করিয়া সাত-আট মাইল দূরস্থ বায়তে নুবার দিকে অগ্রসর হইল। ভীষণ বারিপাত ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাহাদের বহু অশ্ব ও ভারবাহী পশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, খাদ্য-দ্রব্য পঁচিয়া গেল, বহুলোক ভগ্নস্বাস্থ্য ও সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। বায়তে নুবায় পৌঁছিয়া আর অগ্রগমন সঙ্গত নহে মনে করিয়া তাহারা পুনরায় শিলা ও তুষারপাতের মধ্যে রমলার ধ্বংসস্তূপে ফিরিয়া গেল।

পবিত্র নগর দর্শনের বড় আশায় ছাই পড়ায় ফরাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া জাফ্‌ফায় চলিয়া গেল। কেহ একরে, কেহ বা টায়ারে প্রস্থান

করিল, আবার কেহ কেহ বার্গাণ্ডীর ডিউকের সহিত প্রান্তরের দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্যদের উৎসাহ বজায় রাখার জন্য রিচার্ড আস্কালন নগরী পুনর্নির্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। এক ভুলের সংশোধন করিতে গিয়া তিনি আর এক ভুল করিয়া বসিলেন। তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটিলে তিনি বিগত অভিজ্ঞতার পর শীত ঋতুতে এরূপ আহ্‌মকি করিতে যাইতেন না। ক্রুসেডারেরা ইবেলিনে এক রাত্রি যাপন করিল। পরদিনের শিলা-বৃষ্টিতে তাহাদের মুখে বরফ জমিয়া গেল। অতি কষ্টে কর্দম-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন আশ্রয় লাভের আশায় আস্কালনে হাজির হইল, তখন ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না।

আস্কালন পুনর্নির্মাণ এবং কনরাড ও ফরাসীদের সহিত গোল-মালে পরবর্তী চারমাস ব্যয়িত হইল। জার্মান ও ফরাসীরা আবার ক্রুসেডারদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তদুপরি ইংল্যাণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, রাজভ্রাতা জন স্বয়ং রাজমুকুট পরিধানের চেষ্টায় আছেন। শুনিবামাত্র রিচার্ড স্বদেশ যাত্রার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রুসেড চালাইবার জন্য সৈন্যেরা নেতা নির্বাচনে আহূত হইল। নিঃসঙ্কোচে সকলেই কন্‌রাডকে রাজা মনোনীত করিল। গাঈ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাইপ্রাস রাজ্য পাইলেন। এপ্রিল মাসে কন্‌রাডের সহিত সালাহ্‌উদ্দীনের এক সন্ধি হইল। কিন্তু অল্পদিন পরেই গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার রাজলীলা ফুরাইয়া গেল। সর্বসাধারণের আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে ক্যাম্পেনের হেনরী তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হইলেন।

সালাহ্‌উদ্দীন শান্তিতে জেরুজালেমে শীত ঋতু অতিবাহিত করিলেন। ফরাসীদের পক্ষ হইতে এ সময়ও পত্রালাপ বন্ধ হইল না। ফলে আল্-আদিলের মধ্যবর্তিতায় মার্চের শেষে রিচার্ডের সহিত এক চুক্তি হইল। ঠিক হইল, রাজ্য উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইবে, খৃস্টানেরা ক্রুশকাষ্ঠ ফিরিয়া পাইবে, জেরুজালেমে তীর্থগমন ও পুনরুত্থান-গীর্জায় পুরোহিত নিযুক্তিরও তাহাদের অধিকার থাকিবে। কিন্তু সে যুগের ইউরোপীয় খৃস্টানেরাও প্যালেস্টাইনবাসী-দের ন্যায় অবিশ্বাসের পাত্র ছিল। সালাহ্‌উদ্দীন ও তাঁহার আমীরগণকে অচিরে এই নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইল।

আবেদন জানাইয়া সুলতানের নিকট লোক পাঠাইল। এমন সময় তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ নিয়তির গতি বদ্‌লিয়া গেল।

দুর্গ-শিরে মুসলিম-পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া রিচার্ড উপকূলের কিছু দূরে জাহাজ রাখিলেন। উহা খৃস্টানদের হস্তচ্যুত হইয়া থাকিলে শত্রুবাহিনীর সম্মুখে তীরে অবতরণ করা এমন কি তাঁহার নিকটও নির্বোধোচিত দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে হইল। সহসা একটি লোক নৌ-বহর দেখিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাঁহার নিকট প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া রিচার্ড অবতরণের আদেশ দান করিলেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকায় সালাহ্‌উদ্দীনের বিশ্বাস হইল, তীরে নামিতে শত্রুদের সাহস হইতেছে না। তজ্জন্য তিনি বাধা-দানকারী সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে শৈথিল্য দেখাইলেন। তদুপরি সঙ্কট-কালে আত্ম-সমর্পণের শর্ত আলোচনার জন্য তিনি অনাহূত হইলেন। এই সুযোগে রিচার্ড বাধাদানকারী সৈন্য-গণকে বিতাড়িত করিয়া দুর্গ-প্রাচীরে ক্রুশ-পতাকা উড়াইয়া দিলেন। তখন অবরুদ্ধ সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজপথগুলি মুসলমানশূন্য হইয়া গেল। সালাহ্‌উদ্দীনের আদেশের প্রতি অবহেলার ফল তাহারা হাতে হাতে পাইল। রিচার্ডের সঙ্গে ৫০ খানা জাহাজ দেখিয়া তাহাতে অসংখ্য সৈন্য আছে মনে করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বস্তা ফেলিয়া রাখিয়া সেই ভীরুর দল ভয়ে জাজুরে গায়েব হইয়া গেল। একদল সুবহ অস্ত্রধারী সৈন্য মাত্র সালাহ্‌উদ্দীনের নিকট রহিল।

পলায়ন সম্পূর্ণ হইলেও যুদ্ধ বাকী ছিল। রিচার্ড ইহা খুব ভাল জানিতেন। কাজেই সেইরাত্রে দেওয়ান আবু বকর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি আবার শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সালাহ্‌উদ্দীন এবার আলোচ্য স্থানের সীমা টায়ার ও সিজারিয়ার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিলেন। নগর ত্যাগে বাধ্য হইলেও তিনি যে তখনও পরাজয় স্বীকার করেন নাই, এই উত্তর রিচার্ডকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, সুলতান তাঁহাকে জাফ্‌ফা ও আস্কালন জায়গীর দিলে তিনি তাঁহার লোক হইয়া সসৈন্যে তাঁহার খেদমত করিবেন। সালাহ্‌উদ্দীন জাফ্‌ফা

ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আস্কালন ত্যাগে রাজী হইলেন না। রিচার্ডও কিছুতেই আস্কালনের দাবী ছাড়িতে প্রস্তুত না হওয়ায় এবারও সন্ধির কথাবার্তা ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রকৃতপক্ষে পূর্বের ন্যায় এই আলোচনারও উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা সময় ক্ষেপণ। রাজার সঙ্গে যে সৈন্য ছিল, তাহা যুদ্ধের জন্য আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না। সোমবারে সংবাদ আসিল, ফরাসীরা তাঁহার সাহায্যার্থে একর ত্যাগ করিয়াছে। এভাবে প্রতারিত হইয়া সালাহ্‌উদ্দীন রসদ-পত্রাদি পাহাড়ে পাঠাইয়া দিয়া কেবল নিজস্ব অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়াই ৫ই আগস্ট বুধবার এই নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। রাজার অধীনে ৫৪ জন নাইট ও ৩,০০০ দৃঢ়কায় সৈন্য ছিল। ক্যাম্পেনের আর্ল, লিসেস্টারের আর্ল প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা যোদ্ধাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাহারা সম্মুখে সূক্ষ্মাগ্র, দীর্ঘ শিবির-বন্ধন-দণ্ড ও তৎপশ্চাতে বর্ষার হাতল পুতিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইল। ৭,০০০ মুসলমান অশ্বারোহী সাত দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যূষে খৃস্টানদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু বর্ষা-প্রাচীরে গতিরুদ্ধ হওয়ায় তাহারা কিয়ৎকাল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় বসিয়া রহিল। অতঃপর তাহারা চক্রাকারে ঘুরিয়া মন্থর গতিতে দূরে সরিয়া গেল। এইরূপে ক্রমাগত পাঁচ-ছয়বার আক্রমণ চলিল। এই ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অপরাহ্ণ তিনটার সময় রিচার্ড সদলবলে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তুমুল যুদ্ধের সময় তাঁহার অশ্ব নিহত হইল। মহামতি সালাহ্‌উদ্দীন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দুইটি উৎকৃষ্ট আরবীয় অশ্ব পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত এই সময়োপযোগী অমূল্য উপহার গ্রহণ করিয়া পুনরায় নূতন উৎসাহে মুসলিম দলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মুসলমানেরা একবার পশ্চাদ্দিক হইতে শহর অধিকারের প্রয়াস পাইল। রিচার্ডের নাবিকেরা আকস্মিক ভয়ে জাহাজে পলাইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। বস্তুতঃ সেদিন রিচার্ডের বীরত্ব প্রকাশের দিন। তাঁহার পরাক্রমে মুসলমানেরা সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইল। বস্তুত জাফ্‌ফার রক্ষী-সৈন্যদের প্রতি অসময়ে অহেতুক সদাশয়তা প্রদর্শনই তাহাদের

এই অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী। এমন কি কেহ কেহ সালাহ্‌উদ্দীনকে মুখের উপর 'ইস্‌লাম-ধ্বংসকারী' বলিয়াও ভর্তসনা করিল। তিনি তাহাদিগকে পুনরায় আক্রমণে অগ্রসর হইতে হুকুম করিলে তাহারা স্পষ্ট উত্তর দিল, 'জাফ্‌ফা জয়ের দিন আপনার যে সকল ভৃত্য আমাদিগকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহাদিগকেই আজ যুদ্ধে পাঠাইয়া দিন।' কিছুতেই সৈন্যগণকে আর যুদ্ধে পাঠাইতে না পারিয়া সালাহ্‌উদ্দীন প্রচণ্ড ক্রোধে জেরুজালেম চলিয়া গেলেন। জাফ্‌ফায় রিচার্ডের দখল বহাল রহিল।

রমলার সন্ধি

যাহাদের কর্তব্য-জ্ঞান প্রবল, ক্রোধ কখনই তাহাদের উপর স্থায়ী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। শুক্রবার জেরুজালেম পৌঁছিয়া সালাহ্উদ্দীন নগরের দৃঢ়তা সাধনের আদেশ দান করিলেন। নিজের বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ হওয়ায় এক রাত্রেই তাঁহার সকল রাগ পানি হইয়া গেল। পরদিনই তিনি রমলার শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। যে সকল সৈন্য একে একে দুইবার তাঁহাকে লজ্জিত করিয়াছিল, তিনি আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নূতন সৈন্যের জন্য চারদিকে দূত ছুটিল। যথাসময়ে মিসর, সিরিয়া ও মসুল হইতে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু এই নতুন সেনাদলের কোনই দরকার হইল না। রিচার্ড সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ইংল্যাণ্ডে পূর্ব হইতেই গোলযোগ চালিতেছিল। অন্যান্য ক্রুসেডারও স্বদেশ গমনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের প্যালেস্টাইন ত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়া ফরাসীরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এমতাবস্থায় সন্ধি স্থাপন করা ভিন্ন রিচার্ডের আর কোন উপায় রহিল না। দুইবার পরাজিত হওয়ায় নবীন ও সবল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও সালাহ্উদ্দীনও আর যুদ্ধ চালাইতে উৎসুক ছিলেন না। আল্-আদিল শান্তির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। রাজার অসুখে সুলতানের মনও নরম হইল। ভীষণ জ্বরে পড়িয়া রিচার্ড ঠাণ্ডা ফলের জন্য সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে সদাশয় সুলতান তাঁহাকে পর্বত হইতে অবিরত সেব, নাশপাতি ও সুশীতল বরফ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

আল্-আদিল তখন রোগ-শয্যায় শায়িত। তথাপি রিচার্ডকে তাঁহার শরণ লইতে হইল। সন্ধি-শর্ত স্থির করার জন্য তিনি দেওয়ান আবু বকরের মারফতে তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে কোন কাজই অসিদ্ধ থাকে না। কাজেই সন্ধির পথ সুগম হইয়া আসিল। রিচার্ড এবারও আস্কালনের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু বিধির বিধি অন্যরূপ। ২৮শে আগস্ট

শুক্রবার হইতে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত দূতেরা আল-আদিল এবং রিচার্ড ও সালাহ্উদ্দীনের শিবিরের মধ্যে দৌত্যকর্মে ব্যস্ত রহিল। ২রা সেপ্টেম্বর পরবর্তী ইস্টার হইতে তিন বৎসরের জন্য উভয় পক্ষে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহার ফলে একর হইতে জাফ্ফা পর্যন্ত সমগ্র পুনর্বিজিত উপকূল রিচার্ডের দখলে রহিল, খৃস্টানেরা অবাধে জেরুজালেমে তীর্থ-যাত্রার অধিকার পাইল। কিন্তু আস্কালন ভূমিসাৎ করাই সাব্যস্ত হইল। এই সংবাদে রণক্লান্ত সৈনিক মহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

৯ই আক্টোবর রিচার্ড একরে জাহাজে উঠিলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি তিন বৎসর পরে পুনরায় আসিয়া জেরুজালেম উদ্ধার করিবেন বলিয়া সালাহ্উদ্দীনকে ধমকাইয়া গেলেন। সুলতান উত্তর পাঠাইলেন, যদি তাঁহাকে রাজ্য হারাইতেই হয়, তবে অপর যে কোন লোক অপেক্ষা রিচার্ডের হাতে হারানই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। এইরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই জন বিভিন্ন-প্রকৃতি বীর-পুরুষের বিদায়-পর্ব সমাপ্ত হইল। ক্রুসেডারেরা প্রস্থান করায় দীর্ঘকাল পরে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। হিংস্র ও পশু-প্রকৃতি * রিচার্ড প্যালেস্টাইনে যে দুর্ব্যবহারের বীজ বপন করেন, শীঘ্রই তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। আদ্রিয়াতিক সাগরে প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া তাঁহার জাহাজ ভগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি ছদ্মবেশে পদব্রজে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। প্যালেস্টাইনে অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ডের সহিত তাঁহার কলহ হয়। নিজের পতাকার পার্শ্বে অস্ট্রিয়ার পতাকা উড়িতে দেখিয়া তিনি উহা অবজ্ঞাভরে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অপমানিত লিওপোল্ড সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া অতিক্রমের সময় রিচার্ড তাঁহার হাতে ধরা পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে জার্মান-সম্রাট ষষ্ঠ হেন্‌রীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। রিচার্ডের দুর্ব্যবহারে হেনরীও তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। চার মাস পরে ইংরেজরা বিপুল অর্থ কর দিয়া

*..."if heroism be confined to brutal and ferocious valour, Richard Plantagenet will stand high among the heroes of the age." —Gibbon, vi, 380.

তাঁহার মুক্তি সাধন করিল। দেশে আসিয়াই তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব মিত্র ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু চেলুজ অবরোধ-কালে তাঁহার মৃত্যু হইল। প্যালেস্টাইনে গিয়া পুনরায় সাহস ও বর্বরতা প্রদর্শনের আশার এভাবে সমাধি ঘটিল।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর ক্রুসেড শেষ হইল। সালাহউদ্দীনের শৌর্য-বীর্যের মূল্যায়নের নিমিত্ত ইহার ফলাফল খতাইয়া দেখা দরকার। ১১৮৭ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের পূর্বে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে এক ইঞ্চি ভূমিও মুসলমানদের হাতে ছিল না। ১১৯২ খৃস্টাব্দে রমলার সন্ধির পরে টায়ার হইতে জাফ্‌ফা পর্যন্ত সমুদ্র-তটস্থ এক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড ব্যতীত সমগ্র দেশ তাহাদেরই দখলে আসিল। কাজেই সন্ধি সম্বন্ধে সালাহ্‌উদ্দীনের লজ্জিত হইবার কোনই কারণ ছিল না। পুনর্বিজিত জনপদের অধিকাংশই ফরাসীদের দখলে রহিল বটে, কিন্তু ক্ষতির তুলনায় এই লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একমাত্র একর জয় করিতেই তিন লক্ষ খৃস্টান মৃত্যুমুখে পতিত হয়।* পোপের আবেদনে নিখিল খৃস্টান জগত সালাহ্‌উদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। আর সমগ্র ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের প্রত্যেকটি লোকের সম্পত্তির দশমাংশ 'সালাদিন কর'রূপে গ্রহণ করে। রিচার্ড তাঁহার যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি, তালুক-জমা, মণিমাণিক্যাদি এমন কি দুর্গ ও বিচারকের পদ প্রভৃতি পর্যন্ত বিক্রয় করেন। অধিকন্তু উপযুক্ত ক্রেতা পাইলে তিনি লণ্ডন বেচিতেও রাজী ছিলেন। জার্মানীর সম্রাট, অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড, বার্গাণ্ডীর ডিউক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও সিসিলীর রাজন্যবৃন্দ, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ক্যাম্পেনের কাউন্ট এবং যাবতীয় খৃস্টান জাতির শতসহস্র বিখ্যাত ব্যারণ ও নাইট সালাহ্‌উদ্দীনের হাত হইতে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য প্যালেস্টাইনের রাজা ও প্রিন্সগণ এবং টেম্পলার ও হস্পিটালার সম্প্রদায়ের অদম্য বীরদের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু এত রক্তপাত, এত অর্থব্যয় সবই নিরর্থক হইল। সম্রাট সপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, লিওপোল্ড ও অন্যান্য নরপতি পণ্ডশ্রমের পর দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষের দেহাস্থি এশিয়ার বালুকণার সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু জেরুজালেম সালাহ্‌উদ্দীনেরই

*"The capture of Acre alone was said to have cost 3,00,000 of men."—Ground-work of British History, P. 97.

দখলে রহিল। উহার নামকা-ওয়াস্তে রাজা একরে এক সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাজেই তৃতীয় ক্রুসেডকে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।*

তৃতীয় ক্রুসেডে নিখিল খৃস্টান বিশ্বের সমবেত শক্তিও সালাহ্-উদ্দীনের ক্ষমতা রুখিতে পারে নাই।** বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কঠিন ও বিপদ্-সঙ্কুল অভিযানে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে; তাঁহার অবিশ্রান্ত আদেশে সুদূর তাইগ্রীস নদীর উপত্যকায় তাঁহার জায়গীরদারদের মধ্যে আর্তনাদের রোল উঠিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার ডাকে জীবন উৎসর্গ করিতে তাঁহাদের কেহই কখনও অস্বীকার করেন নাই। জিহাদের সময় তিনি মিসর, মেসোপটেমিয়া এবং উত্তর ও মধ্য সিরিয়ার সৈন্যদলের সহায়তার উপর বরাবরই নির্ভর করিতে পারিতেন। তাঁহার হুকুমে কুর্দী, তুর্কী, আরব, মিসরীয় সকলেই তাঁহার খেদমতে হাজির হইত। তাহাদের বর্ণগত পার্থক্য, জাতিগত বিদ্বেষ ও বংশগত অহঙ্কার সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত পূর্বাপর তাহাদের ঐক্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন। তিনি তাহাদিগকে যেভাবে পুনঃ পুনঃ আহবান করেন, তাহাতে যে কোন রাজভক্ত ও ঈমানদার লোকের ধৈর্যের বাঁধ টুটিয়া যাওয়ার কথা। তাহা ছাড়া ইহা দানবের শক্তিকেও ক্লিষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তথাপি একজন আমীর বা জায়গীরদারও বিদ্রোহী হন নাই, একটি প্রদেশও তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই। মেসোপটেমিয়ায় তাঁহারই স্ববংশজাত জনৈক যুবক একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সত্য, কিন্তু কেহই সেই নিমক-হারামের সাহায্য করে নাই। জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব কত অটুট ছিল, ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার পরেও তিনি তাইগ্রীস নদী হইতে আফ্রিকার ত্রিপোলী ও ভারত মহাসাগর হইতে আর্মেনিয়ার পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজত্ব করিতেছিলেন।*** এই

* Stevenson, Crusades in the East, 289.

** "All the strength of Christendom concentrated in the Third Crusade had not shaken Saladin's "power."—Lane-poole, 359.

*** "His empire was spread from the African Tripoli to the Tigris and from the Indian Ocean to the mountains of Armenia."—Gibbon, vi 269.

সকল সীমান্তেরও বহু দূরে জর্জিয়ার রাজা, আর্মেনিয়ার ক্যাথলিক ভূপতি, কুনিয়া বা রুমের সুলতান ও কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করিতে ব্যগ্র ছিলেন, এমন কি সুদূর জার্মানীর সম্রাটও তাঁহার মিত্রতায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।

ইন্তেকাল

ফ্র্যাঙ্কেরা দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে সমুদ্র-তটে বিতাড়িত এবং খৃস্টান ও মুসলমানের পবিত্র স্থানগুলি আবার সালাহ্উদ্দীনের হস্তগত হইলে দীর্ঘকাল পরে তিনি বিশ্রামের অবকাশ পাইলেন। কিন্তু আপাততঃ তিনি আরাম করিতে পারিলেন না। সৈন্যগণকে গৃহগমনের জন্য বিদায় দান করিয়াই তিনি জেরুজালেম-যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানে মনোযোগী হইলেন। একরে তাহাদের জাতি হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বহু মুসলমান উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু ন্যায়বান জুদিকের সদয় শাসন ও প্রহরীবৃন্দের সতর্কতার ফলে কেহই তীর্থযাত্রীদের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না, বরং তাঁহারা খুব উদার ব্যবহার পাইলেন।* সেপ্টেম্বরে সেলিসবারীর বিশপ হিউবার্ট ওয়াল্টার জেরুজালেমে আসিলে সুলতান তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপহার দিলেন। খৃস্টের সমাধি-সেবায় ত্রুটি হইতেছে দেখিয়া তিনি জেরুজালেম, বেথেলহাম ও নাজারেসে দুইজন লাটিন পুরোহিত ও বিকন বা নিম্নপদস্থ যাজক নিয়োগের অনুমতি চাহিলে সদাশয় সুলতান তাহাও মঞ্জুর করিলেন। অথচ চার মাস পূর্বে গ্রীক সম্রাট গোঁড়া খৃস্টান সমাজের পক্ষ হইতে পুরোহিত নিয়োগের জন্য অনুরূপ প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থকাম হন। যে সকল বাজে ওজর দেখাইয়া ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এই পুরোহিত নিয়োগের দাবী উহার অন্যতম। সুদূর দ্বাদশ শতাব্দীতেও পবিত্র স্থানের যাজকতা লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে দেখিয়া বাস্তবিকই কৌতূহল জন্মে।

ক্রুসেডারদের তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলে সালাহউদ্দীন নব-বিজিত রাজ্য পরদর্শনে বাহির হইলেন। প্রধান নগর ও দুর্গগুলি পরিদর্শন করিয়া তিনি প্রয়োজনানুযায়ী উহাদের দৃঢ়তা সাধন ও প্রত্যেকটি স্থানে নূতন সৈন্য স্থাপন করার ব্যবস্থা করিলেন। এন্টিয়কের প্রিন্স তোতলা বহেমণ্ড রমলার সন্ধিতে অংশ গ্রহণ করেন।

* "The pilgrims were treated generously." ...Archer & kingsford, 347.

১লা নভেম্বর তাঁহাকে বৈরুতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা হইল। এই উপলক্ষে প্রিন্স এন্টিয়কের প্রান্তরে ১৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা আয়ের ভূমি উপহার পাইলেন। কাউকাবে (বেলভয়ের) তাঁহার পুরাতন কর্মচারী কারাকুশের সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার বিনানুমতিতে শত্রুহস্তে একর সমর্পণ করিলেও তিনি তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও তিরস্কার না করিয়া পুরাতন ও পরীক্ষিত ভক্তের উপযোগী সমাদর করিলেন। সর্বসাধারণের উচ্চ আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে ৪ঠা নভেম্বর তিনি দীর্ঘ চার বৎসর কাল পরে দামেশ্কে ফিরিয়া আসিলেন।

এবার সালাহ্উদ্দীন সত্যই বিশ্রামের অবসর পাইলেন। কিন্তু কে জানিত, এই বিশ্রাম এত শীঘ্র চির-বিশ্রামে পরিণত হইবে? প্রজাবর্গের সুখশান্তি অব্যাহত রাখার জন্য সন্ধিশেষে তিনি ইউরোপে গিয়া খৃস্টানদের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে তাঁহার সে আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না। ক্রুসেডের সময় তিনি অসুস্থ শরীরেও শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেন, তাহা তদপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ লোকেরও স্বাস্থ্যভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একর অবরোধের সময় কেহ এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলে তিনি একটি আরবী প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, 'আমার সহিত আমরকেও মারিয়া ফেল।' বস্তুতঃ ফ্র্যাঙ্কেরা মরিলেই সালাহ্উদ্দীন মরিতে রাজী ছিলেন। তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায় তাঁহার আর বাঁচিবার প্রয়োজনীয়তা রহিল না। হজ্ব করার জন্য তিনি ভারি উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তখন হাজীরা মক্কা-মদীনা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য নগরের বাহিরে গমন করিলেন। অবিশ্রান্ত বারিপাতে রাজপথে জলস্রোত বহিতেছিল। অথচ অসাবধানতাবশতঃ সেদিন অঙ্গরাখা পরিধান করার কথা তাঁহার স্মরণ ছিল না। ফলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সে-রাত্রেই তাঁহার জ্বর হইল। অধিকন্তু, কিছুদিন হইতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর দুই মাস কাজা রোজা রাখায় তাঁহার শরীরও দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। তার ফলে পরদিন তিনি বন্ধুদের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগদান করিতে পারিলেন না। পিতার আসনে পুত্রকে দেখিয়া অনেকের পক্ষেই অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

দিন দিন সুলতানের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। মাথাবেদনা ও মানসিক অশান্তিতে তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিনে চিকিৎসকেরা তাঁহার রক্তপাত করাইলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার অবস্থা আরও খারাপ হইল; তাঁহার চর্ম শুকাইয়া গেল; তিনি দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িলেন। নবম দিনে তিনি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন; তাঁহার মানসিক চৈতন্য লোপ পাইল; তিনি আর পথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। প্রতি রাত্রে তাঁহার কাতিব বাহাউদ্দীন ও প্রধান বিচারপতি কাজী আল্‌-ফাজিল তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। প্রাসাদের বাহিরে আসিলে তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিতে থাকিত। উদ্বিগ্ন জনতার নিকট হইতে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার জন্য তাঁহারা বৃথাই অশ্রুরোধের চেষ্টা করিতেন।

রবিবার (দশম দিনে) রোগের কিছু উপশম হইল। রোগী যথেষ্ট পরিমাণ বার্লি ও পানি পান করিলেন। দর্শকদের বিষণ্ণ হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের আকস্মিক প্রজ্জ্বলন মাত্র। মঙ্গলবার রাত্রে বিশ্বস্ত কাতিব ও প্রধান কাজী দুর্গে আহূত হইলেন; সুলতান দ্রুত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। জনৈক আলিম তাঁহার নিকটে ঘেঁষিয়া কলেমা ও কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিনি যখন পড়িলেন, "আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই; তিনি প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ সবই জ্ঞাত আছেন; তিনি দয়ালু ও দাতা।" তখন সালাহ্‌উদ্দীন অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সত্য।' অতঃপর তিনি পড়িলেন, 'আমি তাহাতেই বিশ্বাস করি।' এবার রোগী মৃদু হাস্য করিলেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই চিরশান্তির আলয় মহাপ্রভুর নিকট তাঁর আত্মা গমন করিল। ১১৯৩ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ বুধবার মহামতি সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন এক কন্যা ও সতেরটি পুত্রসন্তান রাখিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৫ বৎসর।

মৃত্যুর দিনই আসর নামাজের সময় তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত হইল। যে তরবারি লইয়া তিনি জিহাদে যাইতেন, তাহা তাঁহার পার্শ্বে রক্ষিত হইল। তাঁহার যথাসর্বস্বই পরোপকারিতায় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করার অর্থ, এমন কি কবর খুঁড়িবার

ইট প্রস্তুত করার খড় পর্যন্ত ধার করিতে হইল।* একখানা সামান্য ডোরাদার বস্ত্রে শব-যান আচ্ছাদিত করিয়া নিতান্ত দরিদ্র লোকের ন্যায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কোন কবিই শোক-সঙ্গীত গাহিবার বা কোন বক্তাই প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার অনুমতি পাইলেন না। দলে দলে লোক তোরণের পার্শ্বদেশ জনাকীর্ণ করিয়া ফেলিল। শবযান দেখিয়া তাহাদের মধ্যে বুক-ফাটা ক্রন্দনের রোল উঠিল। সেদিন যেন দ্বিতীয় রোজ-কিয়ামত। প্রত্যেকের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইল। উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে নাই, এমন কেহ ছিল না বলিলেই চলে। মানুষ এত বিকল-চিত্ত হইল যে, জানাজার নামাজও ভাল করিয়া পড়িতে পারিল না। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া মাত্র তাহারা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। পরদিন তাহারা বিলাপ করিয়া, নামাজ ও কুরআন পড়িয়া মৃতের আত্মার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া চাহিতে লাগিল। শোকাভিভূত জনমণ্ডলী কবরস্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বর্তমান সময়ে পর্যটকেরা মহামতি সুলতানের যে কবর জিয়ারত করিয়া থাকেন, উহা তাঁহার মূল সমাধি নহে। প্রথমে তাঁহাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়, দুই বৎসর পরে তাঁহার এক পিতৃ-বৎসল পুত্র ঐ স্থান হইতে তাঁহার দেহাবশেষ উঠাইয়া নিয়া বিরাট উমাইয়া মস্‌জিদের পার্শ্ববর্তী কেল্লাসার উত্তরদিকে সমাহিত করেন। ইহাই এখন সালাহ্‌উদ্দীনের সমাধি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বিশ্বস্ত কাজীও শীঘ্রই মরহুম সুলতানের অনুগমন করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সুলতানের সমাধির উপর লিখিয়া যান, "হে আল্লাহ্, তিনি যে সর্বশেষ বিজয়ের প্রত্যাশী ছিলেন, এই আত্মা গ্রহণ করিয়া সেই স্বর্গ-দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিন।"

* "He had given away everything, and the money for the burial had to be borrowed, even the straw for the bricks that made the grave." ...Lane-poole. 366.

রাজর্ষি সালাহ্‌উদ্দীন

"In his virtue and in those of his patron they admitted the singular union of the hero and the saint; for both Noureddin and Saladin are ranked among the Mahometan saints."—Gibbon.

'প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর অধীন'; সালাহ্‌উদ্দীনও মৃত্যুবরণ করিলেন। কিন্তু মৃত্যুতেই কি সেই ইউরোপ-ত্রাস মহাবীরের সব শেষ হইয়া গেল? তাজমহল শাহ্‌জাহানকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, পিরামিড নিখিল বিশ্বে প্রাচীন মিশরীয়দের কীর্তিকলাপ বিঘোষিত করিতেছে। সালাহ্‌উদ্দীন ইহার কিছুই রাখিয়া যান নাই। বরং তাঁহার উপেক্ষার ফলে ফাতিমিয়া খলীফাদের চমৎকার প্রাসাদগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর-স্তূপ রাখিয়া না গেলেও অনুপম চরিত্র তাঁকে মরজগতে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার পীড়িত অবস্থায়, বিশেষতঃ ইন্তেকালের দিন লোকে যেরূপ শোক-বিহ্বল হয়, জগতে তাহার তুলনা কোথায়? বিখ্যাত চিকিৎসক আবদুল লতীফের মতে কখনও অপর কোন রাজার মৃত্যুতে প্রজারা এরূপ আন্তরিক শোক প্রকাশ করে নাই। বস্তুতঃ প্রজা-প্রীতিতেই সালাহ্‌-উদ্দীনের ক্ষমতার রহস্য নিহিত। অন্যেরা যাহা ভয় ও কঠোরতার দ্বারা লাভ করার চেষ্টা করিতেন, তিনি দয়া দেখাইয়াই তাহা সম্পন্ন করিতেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে শাহ্‌জাদা আজ্‌-জহীরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগকালে তিনি উপদেশ দেন, "রক্তপাতে বিরত থাকিও, তাহাতে বিশ্বাস করিও না, ভূ-পতিত রক্ত কখনও নিদ্রা যায় না। তোমার প্রজা, উজীর, আমীর ও সম্ভ্রান্ত লোকদের চিত্তজয়ের চেষ্টা করিও; প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। দয়া ও বিনয় দ্বারা লোকের চিত্তজয় করিয়াই আমি এরূপ শক্তিশালী হইয়াছি।" বস্তুতঃ দয়া, করুণা ও যোগ্যতাই ছিল তাঁহার নেতৃত্বের ভিত্তি। দেয়বার্ন ও হারুনুর রশীদের সংগে আজিও তিনি প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি।

বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। আড়ম্বর প্রদর্শন বা আচারানুষ্ঠানাদি বিষয়ে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন দূরের কথা, কখনও কোন নরপতি তাঁহার তুলনায় অধিকতর আনন্দদায়ক ও সহজগম্য ছিলেন না।* সুচতুর কথকেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত; তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অনাবিল আনন্দভোগ করিতেন। আরবদের যাবতীয় কিংবদন্তী, বীরপুরুষদের জীবনী ও বিখ্যাত ঘোটকীর বংশ-বিবরণ তাঁহার জানা ছিল। তিনি জনসাধারণের বাক-স্বাধীনতা খর্ব করা পছন্দ করিতেন না। ফলে তাঁহার দরবারেও একটা অরাজোচিত 'ভ্যানভ্যানানি' পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু ইহারও সীমা ছিল। তাঁহার সম্মুখে কেহই বাচালতা করিতে সাহস পাইত না। তিনি নিজে কখনও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিতেন না, অন্যকেও করিতে দিতেন না; এমন কি অত্যধিক উত্তেজনার সময়ও তাঁহার জিহবা ও কলম সংযত থাকিত। তিনি কখনও কাহাকে একটি কটু কথা লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

সালাহ্ উদ্দীন সরল, শ্রমশীল ও ঘোর আত্মসংযমী ছিলেন। তিনি মোটা পশমী কাপড় পরিধান করিতেন। সাধারণ পানিই ছিল তাঁহার একমাত্র পানীয়। একবার দামেশ্‌কে তাঁহার জন্য একটি চমৎকার শিবির নির্মিত হয়। তিনি উহার দিকে ভালরূপে দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'যিনি মৃত্যুর প্রত্যাশী, ইহা তাঁহার জন্য নহে।' নিজের বিলাসিতার জন্য তিনি একটি উদ্যান বা প্রাসাদও প্রস্তুত করেন নাই। মিশরের সালতানাত তাঁহার হাতে আসিলে তিনি সেনাপতিগণকে মহাড়ম্বরপূর্ণ পূর্ব প্রাসাদ ও আল্-আদিলকে পশ্চিম প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং উজিরের প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিত্রে অর্থ-গৃধ্নুতার বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না। ফাতিমিয়া খলীফা ও নূরুদ্দীনের মৃত্যুতে তিনি বিপুল অর্থ লাভের সুযোগ পান; কিন্তু খলীফার ধনভাণ্ডার তিনি সৈন্যদের মধ্যে বিলাইয়া দেন ও নূরুদ্দীনের অর্থ সালেহকে দান করেন। উহার এক কপর্দকমাত্রও তিনি নিজে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকে ন্যায়তঃ রাজর্ষি বলা হয়। কিন্তু সর্বসাধারণের পূর্তকার্যের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সিরিয়া, মিশর ও আরবে তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ ও

* "No sovereign was ever more genial or easy of approach." —Lane-poole, 368.

হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তাঁহার আমলে কায়রোতে তরবারি নির্মাতাদের দোকানের ন্যায় মাদ্রাসা নির্মিত হইয়াছিল; একমাত্র দামেশ্‌কেই বিশটি মাদ্রাসা, একটি হাসপাতাল ও দরবেশদের বহু আস্তানা ছিল। বিলাসিতা ও আত্মতুষ্টিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার এক পুত্রকে কোন দাসকন্যার প্রতি আসক্ত দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

ইতিহাস সালাহ্‌উদ্দীনের সদ্‌গুণের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি ছিলেন যেমনি মহাপ্রাণ, তেমনি শিষ্টাচারী। একবার বৃষ্টির দিনে তিনি বাহাউদ্দীনের সঙ্গে জেরুজালেমের রাস্তা দিয়া পাশাপাশি গমন করিতেছিলেন। সহসা কাতিবের অশ্ব সুলতানের গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিল। বাহাউদ্দীন আতঙ্কে পশ্চাতে সরিয়া গেলেন, কিন্তু মহাপ্রাণ সম্রাট মৃদু হাস্য করিয়া লজ্জিত কাতিবকে পাশে টানিয়া আনিলেন। আর একবার তাঁহার এক ভৃত্য জুতা ছুঁড়িয়া মারিলে উহা প্রায় সুলতানের গায়ে আসিয়া লাগিল। কিন্তু তিনি যেন তাহা লক্ষ্য করেন নাই. এভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। একদিন তিনি অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হইয়া আসিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ মাম্‌লুক একখানা দরখাস্ত লইয়া হাজির হইল। সালাহ্‌উদ্দীন বিন্দুমাত্রও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং দোয়াত-কলম আনিয়া তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। প্রত্যহ বহু লোক তাঁহার নিকট দরখাস্ত লইয়া আসিত। তাহারা তাঁহার গালিচা পর্যন্ত মাড়াইয়া ফেলিত। কিন্তু তিনি বরাবরই নিজ হাতে তাহাদের আবেদন-পত্র গ্রহণ করিয়া অনুযোগের প্রতিকার করিতেন। কখনও কেহ তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই।

সালাহ্‌উদ্দীনের ন্যায়-বিচারের তুলনা বিরল। সোম ও বুধবারে তিনি কাজী ও ফকীহ্‌দের সহিত আদালতে বসিতেন। তিনি নিজে কোন সুবিধা চাহিতেন না, অন্যকেও গ্রহণ করিতে দিতেন না। যে কোন দীনহীন লোক উজীর, এমন কি খোদ সুলতানের বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা করিতে পারিত।* সে সময় তাঁহাদিগকেও সাধারণ আসামীর ন্যায় আদালতে হাজির হইতে হইত। বিচারে সুলতানের জয় হইলে তিনি সম্মানজনক পোশাক পরাইয়া ও খরচ-পত্র দিয়া

* Gibbon, vi, 370-3.

বাদীকে আনন্দিত ও বিস্মিত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ বিচারকের নিকট কেহ কঠোর ব্যবহারের আশঙ্কা করিতে পারিত না। তাঁহার মুখ দেখিলেই লোকে দয়ার পরিচয় পাইত। ভৃত্যগণকে প্রহার করা তখন আবশ্যক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সালাহ্‌উদ্দীনের ভৃত্যেরা তাঁহার অর্থাদি চুরি করিলে তিনি তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, কখনও কোড়া মারিতেন না।

শিশুদের প্রতি স্নেহ সালাহ্‌উদ্দীনের চরিত্রের এক মনোরম অঙ্গ। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেক এতীম (পিতৃহীন বা পিতৃমাতৃহীন) বালক-বালিকার রক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। পুত্রকন্যাদের সংসর্গে তিনি খুব আনন্দ পাইতেন। তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাঁহারা যাহাতে যুদ্ধ-কার্য দর্শন করিতে না পান, সে দিকে তাঁহার কড়া নজর ছিল। তিনি বলিতেন, 'শিশুরা প্রাণ বধে আনন্দ লাভ করুক, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।' তাহাদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ছিল। একদিন ফ্র্যাঙ্কদের নিকট হইতে কয়েকজন দূত আসিল। তাঁহাদের মুণ্ডিত চিবুক, কর্তিত কেশ ও অদ্ভুত পোশাক দেখিয়া বালক আবুবকর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল পিতা শুধু সন্তানের কথা মনে করিয়া এমন কি সংবাদ জ্ঞাপনের পূর্বেই দূতগণকে কোন ওজরে বিদায় করিয়া দিলেন।

সর্বোপরি সালাহ্‌উদ্দীন ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। ইসলাম সরলতা ও কঠোর আত্মত্যাগের ধর্ম; সালাহ্‌উদ্দীনের ধর্মবিশ্বাসও ছিল অত্যন্ত দৃঢ়, সরল ও অকপট। দার্শনিক ও জড়বাদীদিগকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কেবল এখানেই তাঁহার বাড়াবাড়ি দেখা যাইত। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া তিনি পূত দার্শনিক আস্‌-সাহ্‌রাওয়ার্দীর প্রাণদণ্ড বিধান করেন। ইনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পূর্বপুরুষ। যুদ্ধের বাহিরে ইহাই তাঁহার একমাত্র নির্দয়তার কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু সনাতন ধর্ম বহাল রাখার জন্য এতদ্ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তরও ছিল না। তিনি যে

রীতিমত ধর্মকার্য করিতেন, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র। কেবল যুদ্ধের সময় বাধ্য হইয়া তিনি দুই মাস রোজা রাখিতে পারেন নাই। চিকিৎসকগণের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া দুর্বল শরীরে কাজা আদায় করার চেষ্টাই সম্ভবতঃ তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাঁহার ন্যায় আর কেহই এত নিয়মিতভাবে নামাজ পড়িত না। ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি জোর করিয়া দাঁড়াইয়া জুমআর নামাজ আদায় করিতেন। কুরআন পাঠ শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ড বাহিয়া চোখের পানি পড়িতে থাকিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, ক্রুসেডে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হজ্ব করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন হাজীদের পরম বন্ধু। শত শত বৎসর ধরিয়া তাঁহাদিগকে এক দুর্বহ শুল্ক দিতে হইত। রজেত্বের প্রথমেই তিনি উহা রহিত করিয়া দেন।

এমনকি তাঁহার পূর্তকার্যেও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার পুণ্যকার্য ও পূর্ত কার্য অজস্র। প্রাসাদ নির্মাণ বা মেরামতে আগ্রহ না থাকিলেও দুর্গাদি নির্মাণ ও মাদ্রাসা, খানকা প্রভৃতি স্থাপনে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নিজামুল মুলকের পর তাঁহার নামই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। কায়রোতে তিনি শাফিয়ীদের জন্য তিনটি, মালিকীদের জন্য দুইটি ও হানাফীদের জন্য দুইটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁহার আমলে দামেশ্ক্, আলেপ্পো, বাআলাবেক, এমেসা, মওসিল, কায়রো ও অন্যান্য শহর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। অবরোধের সময় জেরুজালেমের প্রাচীর স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হয়, সালাহউদ্দীন নিজের তত্ত্বাবধানে চতুর্দিকের প্রাচীর নূতন করিয়া গাঁথিয়া দেন এবং বাহিরে একটি গভীর খাত খনন করেন। পশ্চিম পাহাড় ছিল প্রাচীরের বাহিরে। তিনি প্রাচীর বাড়াইয়া উহার একাংশ নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন; তাহা ছাড়া পশ্চিমদিকের স্তম্ভদ্বার ও মিহরাব দ্বারের মধ্যবর্তী বুরুজগুলিও তিনি পুনঃনির্মাণ করিয়া দেন।

খৃস্টানেরা আল-আকসা মসজিদকে গির্জায় পরিণত করে। তজ্জন্য ইহার অনেক পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। সালাহউদ্দীন কঠোর পরিশ্রমে এগুলি দূর করেন; মসজিদের দক্ষিণাংশকে টেম্পলার নাইটেরা অস্ত্রাগারে পরিণত করে, সালাহউদ্দীন উহাকে জাভিয়া

খাতানিয়ায় পরিবর্তিত করেন। সুলতান নূরুদ্দীন আল-আকসার জন্য একখানা অতি সুন্দর ও সুসম্পন্ন মিম্বার নির্মাণ করাইয়া দেন। সালাহউদ্দীন তাহা আলেপ্পো হইতে আনাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন। সেন্ট জনের নাইটদের পরিত্যক্ত বিরাট বাসভবনকে তিনি উমর মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন এবং তন্মধ্যস্থ গির্জাকে রেমরিস্তানে পরিণত করেন। সেন্ট জনের গির্জাস্থ সন্যাসিনীদের মঠ মাদ্রাসা খানাইহিয়্যায় পরিবর্তিত হয়। ইহার জন্য তিনি বহু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন। ফ্র্যাঙ্কদের জেরুজালেম জয়ের পূর্বেও গির্জাটি বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইত। পেট্রিয়ার্কের বাড়ীকে তিনি খান্‌কায় পরিণত করেন।

আইন, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব চর্চায় সালাহ্‌উদ্দীন অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আলোচনায় উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার আকুল আগ্রহ ছিল; তাঁহার আমলে দামেশ্‌ক্‌, আলেপ্পো বা আলরেক, এমেসা, মওসিল, বাগদাদ, কায়রো ও অন্যান্য নগর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁহার দরবারে অনেক বিদ্বান ব্যক্তির সমাবেশ হয়। আল-জাওয়াদ যেমন জঙ্গীর, সুশিক্ষিত কাজী আল্‌-ফাজিলও তেমনি সালাহ্‌উদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রায়ই তাঁহার হস্তে মিশরের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া যাইতেন। বিখ্যাত ফকীহ্‌ (আইনজ্ঞ) আল্‌-হক্কারী সালাহ্‌উদ্দীনের দরবারের অন্যতম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। কথিত আছে, সুলতান কখনও তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেন না।

বাহাউদ্দীনের সাহায্য না পাইলে সালাহউদ্দীনের শেষ জীবনের এক মুহূর্তও চলিত না। বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসায় তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই সকল অধ্যাপক মধ্যযুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ন্যায় মাদ্রাসা হইতে মাদ্রাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া বেড়াইতেন। বাহাউদ্দীন প্রথমে মওসিলে অধ্যাপকের পদে কাজ করেন, পরে মওসিল-রাজ্যের দূত নিযুক্ত হন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ১১৮৮ খৃস্টাব্দে সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহাকে কাতিবের পদ প্রদান করেন। ইহার পর হইতে তিনি প্রত্যেকটি অভিযানে সুলতানের সঙ্গে থাকিয়া শত্রুদলনে অগ্রণী থাকিতেন। সুলতানের

মৃত্যুর পর তিনি আলেপ্পোর বিচারকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ মাদ্রাসা স্থাপনে ও ফকীহ্‌দিগকে আইন-শিক্ষা দানে উজাড় করিয়া দেন। যখন বার্ধক্যবশতঃ তাঁহার উত্থান-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তখনও তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে বিরত ছিলেন না। সালাহ্‌উদ্দীনের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইমাদুদ্দীন সুলতানের দরবারের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ফকীহ্‌, জ্যোতির্বিদ ও ধর্মশাস্ত্রে তর্কচূড়ামণি। তাঁহার স্বনামে প্রতিষ্ঠিত দামেশকের ইমাদিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপকের পদ হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তিনি রাজসভার সভাপতি ও সিরিয়া রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যে সালাহ্‌উদ্দীনের কৈশোর ও শেষ জীবনের সঙ্গী আরব কবি উসামার নাম উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পারসিক সুফী আস্‌-সাহ্‌রাওয়ার্দী ও হাদীস শাস্ত্রাভিজ্ঞ ইব্‌নে-আসাকির তাঁহারই আমলে আবির্ভূত হন। ১১৭৬ খৃস্টাব্দে ইবনে-আসাকির বেহেশতবাসী হইলে সালাহ্‌উদ্দীন স্বয়ং তাঁহার জানাযায় যোগদান করেন। ঐ বৎসর বিখ্যাত স্পেনীয় কবি ইবনে-ফেরুঁ কায়রোতে উপস্থিত হইলে কাজী আল্‌-ফাজিল তাঁহাকে স্বগৃহে বরণ করিয়া লন। সুশিক্ষিত সুলতান যেমন বিদ্বানের সমাদর করিতেন, তেমনি সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারেও বিশেষ সহায়তা করেন। সেলজুক সভ্যতা তাঁহারই হস্তে পূর্ণতা লাভ করে।

মহামতি সালাহ্‌উদ্দীন

সমগ্র ইউরোপ যখন জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের অজুহাতে মুসলমানদের হাত হইতে নিকট-প্রাচ্য কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এশিয়ায় আপতিত হয়, ইস্‌লামের সেই মহাসঙ্কটকালে সালাহ্‌উদ্দীন স্বধর্ম ও স্বজাতি রক্ষার জন্য নিজের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব। জিহাদের ন্যায় আর কিছুতেই তিনি এত অদম্য উৎসাহ দেখান নাই। স্বভাবতঃই তিনি শান্তি-প্রিয় ও রক্তপাতে পরাঙ্‌মুখ ছিলেন; কিন্তু খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাঁহার প্রকৃতি একেবারে বদ্‌লিয়া যাইত। শত্রুপক্ষের সংখ্যা ও শক্তি লইয়া কখনও তিনি মাথা ঘামাইতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে একটি মাত্র বালক-ভৃত্য লইয়া উভয় দলের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইত। সময় সময় তিনি এইরূপ বিপজ্জনক স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া নির্বিকারে হাদীস পাঠ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার মস্তকের চতুর্দিক দিয়া শর-রাজি 'শন শন' করিয়া চলিয়া যাইত; তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জিহাদে তিনি দেহমন ঢালিয়া দেন; জীবনের সর্বপ্রকার আনন্দ, আরাম ও পারিবারিক সুখ, সবই তিনি এ উদ্দেশ্যে বিসর্জন করেন। শেষ কয় বৎসরে তাঁহার অন্য চিন্তার সময় ছিল না বলিলেই হয়। ধর্মের জন্য এমন কি তিনি বৃহত্তর যুদ্ধেরও পরিকল্পনা করেন। ফ্র্যাঙ্কেরা পালেস্টাইনের বাহিরে বিতাড়িত হইলে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পৃথিবী খৃস্টানশূন্য করাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। দুরন্ত কাল তাঁহাকে এই সঙ্কল্পসিদ্ধির চেষ্টা করিতে দেয় নাই। দিলে মুসলমান ও প্রাচ্যের জন্য তাহা অশেষ মঙ্গলের কারণ হইত।

একবার তিনি এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সর্বাপেক্ষা গৌরবের মৃত্যু কি?' বন্ধু উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু।' সালাহ্‌উদ্দীন বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছি।' একর অবরোধের সময় তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; তাঁহার ভোজনালয়ে গমন-শক্তি রহিত হইয়া যায়।

তথাপি তিনি শত্রুদের সম্মুখে সারাদিন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতেন। লোকে তাঁহার মনোবল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "ঘোড়ার পিঠে থাকিলে রোগ-যন্ত্রণা আমাকে ত্যাগ করিয়া যায়; মাটিতে নামিলেই উহা ফিরিয়া আসে।" বস্তুতঃ যতক্ষণ তিনি আল্লাহ্র কাজে নিরত থাকিতেন, ততক্ষণ তাঁহার কোন কষ্ট হইত না; কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা তাঁহাকে যন্ত্রণা দিত। জেরুজালেমের দৃঢ়তা সাধনের সময় (১১৯১-২) তিনি নিজে শ্রমিকদের কার্য পরিদর্শন করিতে যাইতেন; অনেক সময় তিনি স্বয়ং প্রস্তর বহিয়া নিতেন। ধনী, দরিদ্র সকলেই তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়। ইহা এখনও অনুকরণের যোগ্য।

ধর্ম-যুদ্ধে তিনি তাঁহার শক্তি, স্বাস্থ্য, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেন। এইজন্য তিনি তাঁহার রাজকোষ শূন্য করেন। অবশ্য দান করা তাঁহার স্বভাবধর্ম ছিল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই তিনি অবাধে, অকাতরে ও মুক্তহস্তে অর্থদান করিতেন। পার্থিব ঐশ্বর্যকে তিনি তুচ্ছ ধূলিকণার সঙ্গে তুলনা করিতেন। কাজেই কেহ অর্থ যাচ্ঞা করিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার নিকট লজ্জা-জনক বলিয়া মনে হইত। লোকে তাঁহার নিকট আশাতিরিক্ত দান পাইত; বারংবার প্রার্থনা করিলেও কখনও কাহাকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইত না। 'লোকটা পূর্বে একবার ভিক্ষা নিয়াছে' একথা কখনও কেহ তাঁহার মুখে শুনিতে পায় নাই। বস্তুতঃ অর্থ-লোভী ভিক্ষুকের দল তাঁহাকে দস্তুরমত লুণ্ঠন করিত। মুসলমানের ন্যায় ইহুদী-খৃস্টানরাও তাঁহার দানের অংশীদার হইত।* যে সকল দরখাস্ত বাহাউদ্দীনের হাত হইয়া যাইত, সেইগুলির যাচ্ঞার বহর দেখিয়া তাঁহার লজ্জা পাইত। যুদ্ধের সময় তাঁহার সৈন্যেরা গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। কাজেই দান-বিভাগের পরিচালনা-ভার কেবল সুলতানের হাতে থাকিলে একমাত্র অর্থাভাবেই তাঁহার অবিশ্রান্ত অভিযান অচল হইয়া যাইত। তাঁহার কোষাধ্যক্ষেরা গুরুতর প্রয়োজনের জন্য গোপনে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত রাখিতেন বলিয়াই জিহাদ বন্ধ হইয়া যায় নাই।

* "The Orientals ..seem ignorant of the equal distribution of his aims among the three religions."..Gibbon, vi, 383.

অবশ্য নগদ টাকার অভাবেই সালাহউদ্দীনের দান বন্ধ থাকিত না। কোন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা অপেক্ষা নিজের শেষ জমিটুকু বিক্রয় করাও তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। একমাত্র একর অবরোধের সময়ই তিনি সৈন্যদের মধ্যে ১২,০০০ অশ্ব বিতরণ করেন। অপরিমিত দানের ফলে তাঁহার কোষাগার খালি হইয়া যায়। মৃত্যুর পর তাহাতে একটি মোহর ও সাতচল্লিশটি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। তিনি গৃহ, ভূমি, তৈজসপত্র বা ভূসম্পত্তি—কিছুই রাখিয়া যান নাই। সেই অমিত-বিক্রম সুলতান প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এতদপেক্ষা নিস্বার্থপর, মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ও সম্পূর্ণ ভক্তিভাজন প্রকৃতির লোকের কল্পনা করা কঠিন।* কঠোরতর উপাদানে গঠিত বা সতর্ক অর্থনীতি ও স্বার্থপর কূট-রাজনীতিতে আরও সুদক্ষ হইলে হয়ত তিনি অধিকতর স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু কিছুতেই উদার বীরত্বের আদর্শ ('the type of generous Chivalry') মহামতি সালাহ্‌উদ্দীন হইতে পারিতেন না।

কর্তব্যের অনুরোধে সময় সময় তাঁহাকে শত্রুদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে হইত। তাহা এত সামান্য ও উপেক্ষণীয় যে, খৃস্টানদের দুর্ব্যবহারের তুলনায় তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বাদীদের মুক্তিদান ও পরাজিত শত্রুদের রাজোচিত সম্মান দানে তাঁহার মহানুভাবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এন্টিয়-কের বর্হিমণ্ডকে কয়েকটি গ্রাম প্রদানের ঘটনা এখানে দৃষ্টান্ত হিসবে উল্লেখনীয়। শত্রুদের প্রতি প্রায়ই তিনি আশাতীত সদয় ব্যবহার করিতেন; অপরিণামদর্শীর ন্যায় অপাত্রে করুণা বর্ষণের ফলে তাঁহাকে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইতে হয়। তথাপি শত্রুর প্রতি এই সদাশয়তা প্রদর্শনের দরুনই তিনি মুসলমানের ন্যায় খৃস্টানদেরও সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে তিনি শৌর্যের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হইয়া থাকেন।† প্রধানতঃ এজন্যই ইউরোপীয়েরা তাঁহাকে the great বা মহামতি উপাধি

* "It would be hard to imagine a nature more unselfish, devoted to higher aims or more wholly loveable."—Lane-poole, 375.

† "Saladin had won the respectful admiration of Christian and Moslem alike."...Archer & Kingsford, 367.

দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার অতুল শিভালরীর দরুনই আজ তিনি বহু উপকথার নায়ক। ইতিহাস শত্রুর প্রতি সালাহ্‌উদ্দীনের দয়ার দৃষ্টান্তে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। একবার এক ফ্র্যাঙ্ক বন্দী তাঁহার নিকট আনীত হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই লোকটা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাঁহার মুখ দর্শনের পূর্বে আমার ভয়ের সীমা ছিল না; এখন তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি আমার কোন ক্ষতি করিবেন না।" তাহার অনুমান ব্যর্থ হইল না। সদাশয় সুলতান বাস্তবিকই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আর-একবার একটি অল্প-বয়স্ক শিশুকে মুসলমানেরা ক্রুসেডারদের শিবির হইতে লইয়া গেল। তাহার মাতার করুণ ক্রন্দনে পরদুঃখকাতর সুলতানের চোখে পানি আসিল। তিনি অবিলম্বে শিশুটির উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে তাহার মাতার সহিত শত্রু শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। দুশ্‌মনের প্রতি এরূপ সদাশয়তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

ইতিহাসে সালাহ্‌উদ্দীন

"In a fanatic age ..the genuine virtues of Saladin commanded the esteem of the Christians."—Gibbon.

প্রাচ্যের যে অত্যল্প-সংখ্যক ক্ষণজন্মা পুরুষের নূতন করিয়া পরিচয় দান নিষ্প্রয়োজন, সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহাদের অন্যতম। স্যার ওয়াল্‌টার স্কট তাঁহাকে ইংরেজী-শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস কখনও ইতিহাস হইতে পারে না। কাজেই টেলিসম্যানের রহস্যময় নায়কের ইতিবৃত্ত ও দুঃসাহসিক কার্যাবলী সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সত্তর বৎসরের মধ্যে 'সিংহ-প্রাণ" রিচার্ডের স্বনামখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বীর কোন জীবন-চরিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত হয় নাই। পরলোকগত বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেনপুল প্রথমে এই পুণ্যকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার সালাহ্‌উদ্দীন ও জেরুজালেম রাজ্যের পতন' একখানা অনবদ্য পুস্তক। প্রাচীনতর যে কোন জীবনী অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট।

বাহাউদ্দীন লিখিত সালাহ্‌উদ্দীনের জীবন-চরিত 'আন্‌-নাওয়াদির আস্‌-সুলতানিয়া আল্‌-মাহাসিন আল্‌-ইউসুফিয়া' ও 'ঐতিহাসিকদের জনক' ইব্‌নুল আসীর প্রণীত মওসেলের আতাবেকদের ইতিহাস 'আল্‌-বাহির' প্রামাণ্য পুস্তক। সমসাময়িক বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সত্য নির্ণয়ের চমৎকার সুযোগ ছিল। তদুপরি তাঁহারা দুইজনেই ছিলেন সুশিক্ষিত ও উন্নত চরিত্রের লোক। কাজেই তাঁহাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। সত্য বটে বাহাউদ্দীন স্তুতিকারক; কিন্তু তিনি এত সরল ও শঠতাবর্জিত যে, তাঁহার লেখা 'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত'র ন্যায় বীর-পূজায় পর্যবসিত হয় নাই। বাহাউদ্দীনের ন্যায় ইব্‌নুল আসীরের পুস্তকও স্তুতি-গাঁথা; কিন্তু স্তুতি সুলতানের শত্রুদের। ইব্‌নুল আসীরের পিতা ও ভ্রাতা জঙ্গীবংশের অধীনে উচ্চপদে কাজ করিতেন। কাজেই তাঁহাদিগকে জায়গীরদারে পরিণত করার অপরাধ ক্ষমা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, সালাহ্‌উদ্দীনের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ ইহারই পরিণতি। কিন্তু মুসলমান,

অ-মুসলমান কেহই তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এইগুলিকে 'অসম্ভব ধারণা' ('improbable suggestion') বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও বাহা-উদ্দীন সাধারণতঃ অসাধু নহেন। তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'আল্-কামিল ফিত্তাওয়ারীখ' বা 'ইতিহাসের পূর্ণতা'য় তিনি অধিকতর নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

সালাহ্‌উদ্দীনের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার জন্য ইস্পাহানের ইমাদুদ্দীন ও আরব-কবি ওসামার নাম উল্লেখযোগ্য। ইমাদুদ্দীন একর অবরোধে উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার আল্-ফাত্‌হ আল্-কুন্সী'র একাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ওসামার আত্ম-চরিত 'কিতাবুল ই'তেবার' সে যুগের এক জীবন্ত চিত্র। তিনি (১০৯৫-১১৮৮) ক্রুসেডের এক বৃহত্তর অংশের প্রত্যক্ষদর্শী। বৃদ্ধ বয়সের কয়েক বৎসর তিনি প্রায়ই সালাহ্‌উদ্দীনের সংস্রবে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই অহংকারী আরবের গ্রন্থে অন্যের কীর্তিকলাপ অপেক্ষা আত্ম-প্রশংসার ভাগই বেশী। 'ওফাতুল আয়ান' (বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিতাভিধান) প্রণেতা ইব্‌নে-খাল্লিকান ও 'কিতাবুর রওজাতায়ন' (বাগান-দ্বয়) লেখক আবুশামা—কেহই সালাহ্‌উদ্দীনের সমসাময়িক নহেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা অবগত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন।

এই সকল আরবী গ্রন্থ দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর জার্মান ও ফরাসীদের উদ্যোগে আবার মুদ্রিত হইয়াছে। বাহাউদ্দীন-কৃত সালাহ্‌উদ্দীনের জীবন-চরিত ১৭৩২ খৃস্টাব্দে স্কালটেন্সের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম লীডেন হইতে প্রকাশিত হয়। তৎপরে ইহা ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে প্যারিসে ও ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে 'প্যালেস্টাইন পিলগ্রিম্‌স্ টেক্স্‌ট্ সোসাইটী'র তত্ত্বাবধানে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অপর সমস্ত গ্রন্থই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রকাশিত হয়। কোন কোন পুস্তকের অনুবাদও বাহির হইয়াছে। ইব্‌নুল আসীরের আল্-বাহির ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে প্যারিসে ও আল্-কামিল ১৮৬৬-৭৬ খৃস্টাব্দে টুনবার্গের সম্পাদনায় চতুর্দশ খণ্ডে লীডেনে ও ১৮৭২-৮৭ খৃস্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয়। ইব্‌নে-খাল্লিকানের চরিতাভিধান ১৮৪৩-৭১ খৃস্টাব্দে ডি, স্লেইন্‌কর্তৃক

ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া চারি খণ্ডে ও ওসামার আত্মচরিত এইচ, ডারেনবার্গ কর্তৃক অনূদিত হইয়া দুই খণ্ডে ১৮৮৬-৯৩ খৃস্টাব্দে প্যারিসে মুদ্রিত হয়। ইমাদুদ্দীনের পুস্তকের একাংশ ল্যাণ্ডবার্গের সম্পাদনায় ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে লীডেনে ও আবু শামা-কৃত নুরুদ্দীন ও সালাহ্‌উদ্দীনের জীবনী ১৮৭০-৭১ খৃস্টাব্দে দুই খণ্ডে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। এই মহৎ কার্যের জন্য জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ মুসলমান মাত্রই ফরাসী ও জার্মান মনীষীদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

সেই ধর্মান্ধতার যুগে সালাহ্‌উদ্দীনের প্রকৃত গুণ খৃস্টানদেরও ভক্তি আকর্ষণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে টায়ারের আর্চবিশপ উইলিয়াম ও ইবেলিনের বেলিয়ানের স্কোয়ার (পার্শ্বচর) আর্নুলের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। আর্চবিশপ সে যুগের লাটিন ও আরবী ইতিহাস ভাল জানিতেন। তাঁহার 'হিসটোরিয়া' ও আর্নুলের 'ক্রনিকল' ব্যক্তিগত জ্ঞানের ফল। আর্নুল সালাহ্‌উদ্দীনের দয়া, দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা ও প্রতিজ্ঞাপালন এবং খৃস্টানদের খলতা, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা যেরূপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সে যুগের আর কোন খৃস্টান লেখকই সেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ 'ইটিনেরারিয়াম রেজিস রিচার্ডি'র অজ্ঞাতনামা লেখকের রিচার্ড-পূজার বাড়াবাড়ি দমনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই ইতিহাসগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে প্রথম দুইখানা প্যারিস ও শেষোক্তখানা লণ্ডন হইতে যথাক্রমে ১৮৪৪, ১৮৭১ ও ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। আরবী ইতিহাসের ন্যায় এইগুলিও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে আরও অনেক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মেরিনের 'সিরিয়া ও মিসরের সুলতান সালাহ্‌উদ্দীনের ইতিহাস' (Histoire de Saladin, Sultan de Egypt et de Syria) দুই খণ্ডে ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত হয়। মূল উপকরণ ব্যবহার করিলেও প্রায়ই তিনি 'ঐতিহাসিক কল্পনা'র আশ্রয় লইয়াছেন। ফলে তাঁহার গ্রন্থ অনেকটা বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' বা 'আনন্দমঠ' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' বা 'শাজাহান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয়দের লিখিত অন্যান্য ইতিহাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও

ন্যূনতর পক্ষপাতদুষ্ট। ইহার মধ্যে টি, এ, আর্চারের 'প্রথম রিচার্ডের ধর্মযুদ্ধ' (Crusade of Richard I) গেলি, স্ট্রেঞ্জের 'মুসলিম শাসনে পালেস্টাইন' (Palestine under the Moslems), লেফটেনান্ট কর্ণেল সি, আর, সাণ্ডারের—'জেরুজালেমের লাটিন রাজ্য' (Latin Kingdom of Jerusalem), আর্চার ও কিংসফোর্ডের 'ক্রুসেড', স্যার জি. ডব্লিও. কক্স. বার্টের 'ক্রুসেড', স্টিভেন্‌সনের 'প্রাচ্যে ক্রুসেড' এবং লেনপুলের 'সালাদিন' ও 'কায়রো' উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য 'সালাদিন'ই শ্রেষ্ঠ।

সালাহ্‌উদ্দীনের অসাধারণ গুণাবলী শত্রুমিত্র সকলেরই হৃদয় জয় করে, সকলেই তাঁহার গুণকীর্তনের জন্য লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার প্রধান শত্রু ইংরেজ, জার্মান ও ফরাসীরাই ইহাতে অধিক আগ্রহের পরিচয় দেয়। তাঁহাদের কেহ কেহ এমন কি সালাহ্‌উদ্দীনকে খৃস্টান প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট কালি-কলম ব্যয় করিতেও কসুর করেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের আর কোন নরপতিই শত্রু-মহলে এত জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ জগতের আর কোন রাজার সম্বন্ধেই এত অধিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সালাহ্‌উদ্দীন কেবল মুসলিম প্রাচ্য বা নিকট-প্রাচ্যের নহে, সমগ্র এশিয়ার রক্ষাকর্তা। জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করিয়াই ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত, পূর্বাপর কোন ঘটনা হইতেই তাহা মনে করা যায় না। মহাবীর সালাহ্‌উদ্দীন তিলে তিলে নিজের দেহক্ষয় করিয়া তাহাদের অগ্রগতি রোধ না করিলে এই অভিযান-তরঙ্গ কোথায় যাইয়া প্রতিহত হইত, কে জানে? বস্তুতঃ রোমান আক্রমণ, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ও প্রথম ক্রুসেডের পর কালা আদমী ও তাহাদের সভ্যতার এমন গুরুতর বিপদ আর উপস্থিত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, যাঁহার অনুপম আত্মত্যাগের ফলে এই মহাসঙ্কট কাটিয়া যায়, আরব ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত প্রাচ্যের আর কোন জাতিই তাঁহার মহিমা কীর্তনে তেমন বিশেষভাবে অগ্রসর হয় নাই। আমাদের মত যে সব দেশে ইউরোপীয় বীরপুরুষের জীবনী লেখার ও বৈদেশিক উপন্যাসের ভুরি ভুরি অনুবাদ করার মত লোকের অভাব হয় না, সে দেশেই আদর্শ মানব সালাহ্‌উদ্দীন তেমন কাহারও মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হন নাই, এতদপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

রোমান্সে সালাহ্‌উদ্দীন

"The character of the great Sultan appeals more strongly to Europeans than to Moslems, who admire his chivalry less than his warlike triumphs. To us it is the generosity of the Character, rather than the success of the career than makes Saladin a true, as well as a romantic hero."—Lane-poole.

মহাসুলতান সালাহ্‌উদ্দীনের দিগ্বিজয় অপেক্ষা তাঁহার আদর্শ চরিত্র প্রাচ্যবাসীদের চেয়েও ইউরোপীয়দের হৃদয়-রাজ্যে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জীবনের সফলতা অপেক্ষা চরিত্রের মহত্ত্বের দরুনই তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় নবন্যাসের নায়কেও পরিণত হইয়াছেন। 'রিচার্ড কুয়ার ডি লায়নের রোমান্স'ই এ বিষয়ে মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ইংরেজী রোমান্স। একরের সম্মুখে রোগাক্রান্ত রিচার্ডের শূকর মাংসের অভাবে সারাসিন-মাংস ভোজন, সালাহ্‌উদ্দীনের দূতেরা কয়েকজন বন্দীর মুক্তিপণ দান করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে ঐ সকল বন্দীর সিদ্ধ মুণ্ড পরিবেশন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সালাহ্‌উদ্দীনের পুনঃ পুনঃ পরাজয়, ঐন্দ্রজালিক অশ্ব পাঠাইয়া রিচার্ডকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা, ফেরেশ্‌তা কর্তৃক সতর্ক হইয়া ক্রুদ্ধ রাজা কর্ত্তৃক সালাহ্‌উদ্দীনের দুই পুত্র নিধন—ইহাই এই ভয়ঙ্কর কবিতা পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে সালাহ্‌উদ্দীন কখনও রিচার্ডের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি ছিলেন সেনাপতি। সৈন্যের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধ করার জন্য বরং তিনি রিচার্ডের নিন্দা করিতেন। তাঁহার কোন পুত্র কখনও যুদ্ধে নিহত হন নাই। রিচার্ডকে সদাশয়তা দেখাইয়া জাফ্‌ফার যুদ্ধে তিনি যে অশ্ব উপহার দেন, তাহাই উপন্যাসের কল্যাণে ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। রিচার্ডের পাশবিকতা, সালাহ্‌উদ্দীনের অভগ্ন উৎসাহ ও মধ্যযুগের খৃস্টানদের যাদুবিদ্যা ও অপদেবতায় বিশ্বাস, শুধু এই কয়টি বিষয়েই বইখানিতে সত্যের ছাপ আছে। মুসলমানেরা তখন স্পেনের কর্ডোভা, গ্রানাডা, টলেডো, সালামাঙ্কা প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করিত; ইহাই সেকালের মূর্খ ইউরোপীয়দের নিকট ইন্দ্রজালবিদ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত।

ফরাসী রোমান্সগুলিতে সালাহ্‌উদ্দীনের প্রতি অনেকটা সুবিচার করা হইয়াছে। গল্পগুলি প্রায়ই কাল্পনিক হইলেও তাহাতে সত্যের ছাপ আছে। দৃষ্টান্তস্থলে এম্, এন্, ডি ওয়ালী প্রকাশিত (প্যারিস ১৮৭৬) 'রিম্‌সের জনৈক চারণের গল্পমালা'র কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফ্রান্সের রাণী ইলিনর পর-পুরুষে আসক্ত হওয়ায় তাঁহার স্বামী লুই লি জিউন তাঁহাকে তালাক দেন। পরে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় হেন্‌রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 'সিংহ-প্রাণ' রিচার্ড এই মিলনের ফল। এই সত্য ঘটনাকে চারণ সালাহ্‌উদ্দীনের প্রতি ইলিনরের আসক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ ও এমন কি নিজের ধর্ম পরিবর্তনের প্রস্তাব করায় সুলতান নাকি তাঁহার জন্য একখানা দ্রুতগামী জাহাজ প্রেরণ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ রাণী যখন জাহাজে উঠিতে উদ্যত, তখন রাজা আসিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হন। কিন্তু হায়! এই অভিসারের তারিখে (১১৪৮-৪৯) সালাহ্‌উদ্দীন একাদশ বৎসরের বালক মাত্র! এমন চমৎকার প্রেম-কাহিনী এভাবে অসম্ভব হইয়া পড়ায় বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তবে চারণ সালাহ্‌উদ্দীন আল্-জাগি-সিয়ানি নামক জঙ্গীর জনৈক বিখ্যাত সেনাপতিকে সুলতান সালাহ্‌উদ্দীন বলিয়া ভুল করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু লুইর ক্রুসেডের সময় তিনি জীবিত ছিলেন কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তখন তিনি নিশ্চিতই অতি-বৃদ্ধ। কাজেই এইক্ষেত্রেও এই প্রেমালাপ সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। তবে উপন্যাস ইতিহাসের ধার ধারে না, কাব্যের ন্যায় উহার গতি চিরদিনই নিরঙ্কুশ।

স্থান-কাল সম্বন্ধে চারণের কোন মাত্রা-জ্ঞান নাই। রেমণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনার জন্য একলাফে ১১৪৮ হইতে ১১৮৭ খৃস্টাব্দে হাজির হইতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতে দেখা যায় না। ত্রিপোলিসের কাউণ্টের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিলে হিত্তিনের যুদ্ধে খৃস্টানদের পরাজয় ঘটিত না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু চারণ তাঁহার কাল্পনিক বিশ্বাসঘাতকতাকেই রাজা গাঈ ও অন্যান্য খৃস্টান নেতার বন্দী-দশার জন্য দায়ী করিয়াছেন। তবে অস্থানে অসময়ে হইলেও সালাহ্‌উদ্দীনের সদাশয়তা ইতিহাসের ন্যায় রোমান্সেও যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারণের মতে তিনি রাজার দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে বিশ জন নাইটসহ মুক্তি

দান করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সিরিয়ার উপকূলে তাঁহাদের বন্ধুদের নিকট পাঠাইয়া দেন।

সালাহ্‌উদ্দীন একরের হাসপাতালগুলিতে অর্থ-সাহায্য পাঠাইতেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া চারণ এক চমৎকার গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। সুলতানের এক কাল্পনিক খুল্লতাত তাঁহার সংবাদদাতা। একরের হাসপাতালের সেবাশুশ্রূষার কথা শ্রবণ করিয়া সালাহ্‌উদ্দীন এক শ্রান্তক্লান্ত তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে সেখানে ভর্তি হইলেন; কিন্তু তিন দিনের মধ্যেও কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। অধ্যক্ষের অনেক অনুরোধে অবশেষে তিনি তাঁহার অশ্বের সম্মুখ পদের মাংস ভক্ষণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। সেবকেরা যখন বাস্তবিকই সেই মূল্যবান অশ্বটির পদ কর্তনে উদ্যত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার আর অশ্ব-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা নাই, এখন মেষ-মাংস হইলেই চলিবে।" চারি দিন পরে তিনি অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন এবং প্রতি বৎসর একরের হাসপাতালে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণের নির্দেশ দিয়া এক দান-পত্র প্রস্তুত করিলেন। চারণের মতে মিসরের রাজস্ব হইতে ঐ টাকা অদ্যাপি রীতিমত পাওয়া যায়।

ভিন্‌সেন্ট ডি বিউভায়েস ও পিপিনের লিখিত একটি প্রাচীন উপাখ্যান আছে। মরণোন্মুখ সুলতানের আদেশে তাঁহার পতাকা-বাহক বর্শাগ্রে এক খণ্ড কাফনের বস্ত্র বাঁধিয়া দামেশ্‌কের রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘোষণা করে, "দেখ, প্রাচ্য-রাজ এই বস্ত্রটুকু ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে নিতে পারিবেন না।" চারণও গল্পটি জানেন। তিনি কিন্তু সুলতানের ভৃত্যকে এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার মতে সে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে গিয়া প্রতি রাজপথের কোণে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল, "সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার রাজ্য ও অর্থ-সম্পত্তির মধ্যে শবাচ্ছাদনের জন্য এই ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি কাফনের বস্ত্র মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন।" সুলতানের ধর্মপ্রাণতা, বিনীত স্বভাব ও দীনহীন অবস্থায় মৃত্যুর সহিত গল্পটির কি চমৎকার সাদৃশ্য।

মধ্যযুগের এই সকল গল্প ও সহজ-প্রাপ্য ইতিহাস অবলম্বন করিয়া দুই জন শ্রেষ্ঠ লেখক যে সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সালাহ্‌উদ্দীনকে ইউরোপ—তথা সমগ্র জগতে সুপরিচিত করিয়াছে। স্কটের 'টেলিস্‌ম্যান

বা কবচ গ্রন্থখানা এতই চিত্তাকর্ষক যে, যিনি অন্ততঃ একবার ইহা পড়িয়া দেখেন নাই, তাঁহার অধ্যয়ন বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কেনেথ ও শেরকোহ্ বা ছদ্মবেশী সালাহ্‌উদ্দীনের তর্ক-বিতর্ক, কেনেথের ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ও মুসলিম-বিদ্বেষ, শেরকোহ্‌র জ্ঞান, যুক্তি, ধৈর্য ও পরমত-সহিষ্ণুতা, রিচার্ডের পীড়ার কথা শুনিয়া হাকিমের ছদ্মবেশে সালাহ্‌উদ্দীনের শিবিরে গমন, শত্রু-প্রেরিত চিকিৎসকের ঔষধ সেবন না করার জন্য সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ, রিচার্ডের দৃঢ় ঘোষণা-বাণী—'সালাহ্‌উদ্দীনকে অবিশ্বাস করা পাপ', * হাকিমের চিকিৎসায় রিচার্ড, কেনেথ (স্কটল্যাণ্ডের ছদ্মবেশী যুবরাজ ডেভিড) ও তাঁহার আহত কুকুরের রোগমুক্তি, পুরস্কার দানের প্রস্তাবে হাকিমের সদম্ভ উক্তি—'আমি আল্লাহ্ দত্ত জ্ঞান বিক্রয় করি না', মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত কেনেথের জন্য রিচার্ডের নিকট তাঁহার প্রাণ-ভিক্ষা, 'মরুর হীরা'য় দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় রাণী ও সভাসদেরা মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করিলে রিচার্ডের দৃঢ় প্রতিবাদ—'সদাশয় সুলতানের সৎবিশ্বাসে সন্দেহ করা অকৃতজ্ঞতার চেয়েও গুরুতর অন্যায়',‡ দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাবে সালাহ্‌উদ্দীনের—'প্রভু মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই প্রহরী নিযুক্ত করেন, মেষ-পালকের নিজের জন্য নহে', ইত্যাদি এক-একটি দৃশ্য মহামতি সুলতানের আদর্শ চরিত্রের এক-একটি দিক্ পাঠকের মনে উজ্জ্বলভাবে জাগাইয়া তোলে। মোটের উপর তাঁহার চক্ষে সালাহ্‌উদ্দীন একজন আদর্শ প্রাচ্য বীর। অবশ্য তিনি যে সময় সময় কল্পনার আশ্রয় লইয়া সালাহ্‌উদ্দীনকে লোক-চক্ষে হেয় করেন নাই, এমনও নহে। রিচার্ডের আত্মীয়ার সহিত সায়ফুদ্দীনের পরিবর্তে স্বয়ং সুলতানের বিবাহ হইলে ইংরেজ জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি কলমের এক খোঁচায় যোয়ান ও তাঁহার প্রস্তাবিত স্বামীকে উড়াইয়া দিয়া কাল্পনিক এডিথের আমদানী করিয়াছেন। সালাহ্‌উদ্দীনের প্রেম-পত্র পদদলিত না করিয়াও তিনি বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাইতে পারিতেন। মহামতি সুলতানের এই কাল্পনিক অপমান ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু ঔপন্যাসিকের এরূপ অন্যান্য নিরঙ্কুশতা বা'দ দিলে স্বীকার করিতেই

* "...It were sin to doubt his good faith."—Talisman, 107.

‡ "It were worse than ingratitude", he said, "to doubt the good faith of the generous Soldan."—Talisman, 351.

হইবে যে, স্কট তাঁহার ব্যবহৃত অসম্পূর্ণ দলীল-দস্তাবেজের মধ্য দিয়া অসাধারণ নির্ভুলতার সহিত সালাহ্‌উদ্দীনের প্রকৃত চরিত্র দর্শন ও অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ইতিহাসের সহিত চালাকি করিয়া থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ মহাপ্রাণ সুলতানের দয়া, বিনয়, মহত্ত্ব, সদাশয়তা, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, ন্যায়-বিচার, দানশীলতা, সেনাপতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ গুণের এক জ্বলন্ত চিত্র।

জার্মান লেখক লেসিং-এর 'নাথান দার ওয়াইজ' (Nathan der Weise) নাটক টেম্পলিস্‌ম্যানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের রচনা। স্কটের ন্যায় তিনিও প্রস্তাবিত বিবাহের কথা গ্রহণের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া রিচার্ডের ভ্রাতাকে (সম্ভবতঃ জারজ উইলিয়াম লং-সৌর্ড) নায়কে ও সুলতানের ভগিনী সিত্তাহ্‌কে (প্রকৃতপক্ষে 'সিত্তুশ্‌ শাম' বা 'সিরিয়ার দেবী') নায়িকায় পরিণত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার চিত্রে সত্যের যথেষ্ট আভাস আছে। তিনি সুলতানের সদাশয়তা, অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণা ও আত্মীয়-প্রীতি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সালাহ্‌উদ্দীন বড় বেশী ইউরোপীয়, স্কটের সালাহ্‌উদ্দীনের ন্যায় খাঁটী প্রাচ্য-মুসলমান নহেন। তিনি তাঁহাকে সাধু মুসলমান ও পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সালাহ্‌উদ্দীন সাধু মুসলমান ছিলেন, ইহা সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে মানসিক উদারতা তাঁহার গুণ নহে। কার্যক্ষেত্রেই তাঁহার দয়া ও শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যাইত, চিন্তা-রাজ্যে নহে। খৃস্টানদের প্রতি তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য বীরের বীরত্ব ও ভদ্রতা; কিন্তু তাহারা যে পথভ্রষ্ট, সে বিষয়ে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তিনি বরং অন্যান্য ধর্মের স্পষ্ট প্রতিকূলাচরণ সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু নিজ ধর্মের ভিতর বিরুদ্ধ মত বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন না। সূফী আস্‌-সাহ্‌রাওয়ার্দীর প্রাণদণ্ড এই নীতিরই ফল। সালাহ্‌উদ্দীন ছিলেন পবিত্রতম শ্রেণীর প্রকৃত মুসলমানের আদর্শ।* লেসিং তাঁহার প্রতি যে ধর্মীয় উদারতা আরোপ করিয়াছেন, জীবিত থাকিলে তিনি ঘৃণা ও রোষের সহিত সে সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতেন।

* "He is a type of a true Muslim of the purest breed."—Lane poole, P. 339.

সালাহ্‌উদ্দীনের কাহিনী ছায়া-চিত্রেও স্থান পাইয়াছে। 'ক্রুসেড' ও 'গাজী সালাহ্‌উদ্দীন' নামে দুইটি সুন্দর চলচ্চিত্রে মহামতি সুলতানের অপূর্ব শৌর্য ও উদারতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সালাহ্‌উদ্দীনের জন্মভূমি—অসংখ্য উপকথার জননী প্রাচ্যের উপন্যাসে প্রায় চির-উপেক্ষিত। আরব্য উপন্যাসে ক্রুসেডের কাহিনী একেবারে অনাদৃত হয় নাই। অথচ তাহাতে সালাহ্‌উদ্দীনের নাম-গন্ধও নাই। বইখানা তাঁহারই লীলাভূমি কায়রোতে শেষ আকার প্রাপ্ত হয়। সেখানে তিনি আজিও পূর্বের ন্যায়ই জন-প্রিয়। কাজেই এই উপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মিশরের বাজার, কফিখানা ও গল্পের আড্ডায় তাঁহার সম্বন্ধে নিত্য বহু কাহিনী আলোচিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত হয় নাই। বাস্তবিকই এরূপ একখানা হস্তলিখিত আরবী রোমান্স পাওয়া গিয়াছে। জর্জেন্‌স কর্তৃক ইহা জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকখানা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। রিচার্ডের ভগিনী রুমিলা বন্দী হইলে সায়ফুদ্দীন তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। রুমিলা প্রথমে মুসলমান হইতে স্বীকার করেন; কিন্তু পরে পলাইয়া যান। ইতোমধ্যে সায়ফুদ্দীন শত্রুহস্তে বন্দী হন। কিছুদিন পরে রুমিলা পুরুষের বেশে যুদ্ধ করিতে আসিলে সালাহ্‌উদ্দীন আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। এবার সায়ফুদ্দীনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বস্তুতঃ সালাহ্‌উদ্দীন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে আল্‌-আদিল ও প্রথম রিচার্ডের কোন আত্মীয়ার বিবাহই প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই রোমান্সখানা তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

দীক্ষা-রহস্য

আল-আদিলের সহিত রিচার্ডের কোন আত্মীয়ার বিবাহ যেমন ইউরোপীয় উপন্যাসগুলির প্রধান বিষয়-বস্তু, সালাহ্উদ্দীনের খৃস্টান বা নাইট হওয়া সম্পর্কেও মধ্যযুগের খৃস্টান-লিখিত ইতিহাস ও উপন্যাস সমূহ একমত। রিম্সের চারণের মতে মরণোন্মুখ সুলতান বামহস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া চারটি বিপরীত স্থানে উহার প্রান্ত লাগাইয়া দক্ষিণ হস্তে পানির উপর ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করেন। তৎপর ঐ পানি দেহ ও মস্তকে ঢালিয়া দিয়া তিনটি ফরাসী শব্দ উচ্চারণ করেন। ইহাতে মনে হইল, যেন তিনি নিজে নিজে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই উপাখ্যান সম্ভবতঃ সালাহ্উদ্দীনের নাইটত্বে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপক গল্প হইতে উদ্ভূত। 'রিচার্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লেখক বলেন, "সালাহ্-উদ্দীন বয়ঃপ্রাপ্ত ও অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত হইলে তোরণের হাম্ফ্রের নিকট গিয়া ফ্র্যাঙ্কদের রীতি অনুসারে নাইটের কটিবন্ধ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সায়ফুদ্দীনের পুত্রকেও দীক্ষা গ্রহণের জন্য রিচার্ডের নিকট পাঠাইয়া দেন।" প্রাচীন ছন্দোবদ্ধ রোমান্স "লা অর্ডেন ডি শিভালরী'তে এই বিস্ময়কর অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে দীক্ষাদাতা রেমণ্ডের পুত্র হাগ। কিরূপে নাইট করা হয়, সালাহ্উদ্দীনের অনুরোধে তিনি তাঁহাকে তাহা (তরবারি দ্বারা স্পর্শ করা ব্যতীত) সম্পন্ন করিয়া দেখান এবং নাইটের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। প্রথমে শুধু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া এই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমে তিনি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

সালাহ্উদ্দীন নাইট বা খৃস্টান হন, ইহা শুধু মধ্য-যুগের খৃস্টান ইতিহাস ও উপন্যাসের কথা। আরবী ইতিহাসে এ সম্বন্ধে একটি কথাও নাই। তিনি বাস্তবিকই এরূপ ধর্মবিরোধী কার্য করিলে তাহা লইয়া নিশ্চিত কানাকানি হইত এবং ইহা অবশ্যই শাখা-পল্লবিত হইয়া ইব্নুল-আসীরের কানে উঠিত। বিজাতীয় লেখকেরাও সালাহ্উদ্দীনকে যে দোষে দোষী করিতে সাহসী হন্ নাই, সে সকল কাল্পনিক অভিযোগ তাঁহার ঘাড়ে চাপাইতেও যিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ

করেন নাই, এহেন ঐতিহাসিক যে তাঁহার প্রভু-বংশের শত্রুর এত বড় অপরাধ নীরবে চাপিয়া যাইবেন, কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নহে। ব্যক্তিগতভাবে খৃস্টানদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিলেও তিনি কখনও কোন খৃস্টান প্রতিষ্ঠান বা ধর্ম-প্রচার-সংঘে এক কপর্দকও দান করেন নাই। খৃস্টান ধর্ম তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে উৎসন্ন করার জন্য তিনি জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন না ; বরং স্বেচ্ছায় খৃস্টানদের হস্তে জেরুজালেম ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হইতেন। খৃস্টান হইলে গির্জায় না গিয়া কিছুতেই তিনি দুর্বল অবস্থায়ও মস্‌জিদে যাইতেন না। আর বাইবেলের পরিবর্তে কুরআনের বাণী শুনিয়া মৃত্যুকালে কখনও তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। বস্তুতঃ জীবনে তিনি কখনও এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহাদ্বারা ইস্‌লামের প্রতি তাঁহার বীতশ্রদ্ধা ও খৃস্টান ধর্মের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ প্রকাশ পাইতে পারে। বরং তিনি আদ্যোপান্ত আদর্শ মুস্‌লমানের ন্যায়ই জীবন যাপন করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রত্যেকটি কার্যের সঙ্গে ধর্মের নিবিড় সংশ্রব ছিল। নিছক ধর্ম-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া যিনি নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিবেন এ ধারণা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহাকে নিছক গাঁজাখোরী গল্প ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

অতি-বিখ্যাত লোককে লইয়া এইরূপ কাড়াকাড়ি দুনিয়ার চিরন্তন ব্যাপার। সালাহ্‌উদ্দীনকে লইয়া পাশ্চাত্য জগত যেইরূপ টানাটানি করিতেছে, মহাবীর নেপোলিয়ানকে লইয়াও প্রাচ্যে সেইরূপ কাড়াকাড়ি। যেমন—মিসরে নেপোলিয়ান মস্‌জিদে যাইতেন, মুসলমানী পোশাক পরিতেন। এমন কি তিনি প্রকাশ্যে নিজকে 'প্রকৃত মুসলমান' বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক ফরমান জারি করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।* তাঁহার সৈন্যেরা খৃস্টান মঠ অপেক্ষা মস্‌জিদের প্রতি অধিক সম্মান দেখাইত।‡ কাজেই ইহার মূলে সত্য থাকিতে পারে ; কিন্তু সালাহ্‌উদ্দীন তাঁহার

* "Cadis, Sheikhs and Imams ! tell the people that we too are true Mussalmans."—Archibald J. Dunn, Rise and decay of the Rule of Islam, 169.

‡ "Bonaparte's soldiers respected mosques more than monasteries."—Historians' History of the World, vol. xxiv, 448.

খৃস্টান প্রজাদের ভক্তি লাভের জন্য কখনও এরূপ উক্তি করিয়াছেন বা কোন খৃস্টান রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইতিহাসে এমন কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্নুলের বইতে দেখা যায়, সালাহ্‌উদ্দীন ভাল নাইটকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। বীর বীরকে ভালবাসিবে, ইহা স্বাভাবিক। কাজেই ইহা দ্বারাও তাঁহার খৃস্টান-ধর্ম-প্রীতি প্রমাণিত হয় না। সালাহ্‌উদ্দীনেরও স্বজাতীয় শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহারা এ বিষয়ে নির্বাক কেন?

সালাহ্‌উদ্দীনের খৃস্টান হওয়ার কাহিনীগুলির সহিত এ শ্রেণীর অন্যান্য ব্যাপার ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। জগতের বড় বড় লোককে লইয়া বরাবরই এভাবে কাড়াকাড়ি হইয়াছে, হইতেছে, হইবেও। কেবল প্রাচ্যে নহে, প্রতীচ্যেও এরূপ বিবাদ বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। গ্রীসের সাতটি স্থান হোমারের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিয়াছে। শেকস্‌পীয়ারকে লইয়া ইউরোপের কয়েকটি দেশ আজিও টানাটানি করিতেছে। হোমার, শেক্‌স্‌পিয়ার ও নেপোলিয়ান যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও দিগ্বিজয়ী না হইলে কেহই তাঁহাদিগকে লইয়া এভাবে মাথা ঘামাইত না। সালাহ্‌উদ্দীন কেবল স্বীয় যুগের নহে, যে কোন যুগের সর্বাপেক্ষা মহামতি দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ। তাঁহার সদ্‌গুণরাজি মুসলমান অপেক্ষাও খৃস্টানদের হৃদয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়া এবং তাঁহাকে 'সালাদিন' এই গার্হস্থ্য নাম দিয়াও ইউরোপের তৃপ্তি মিটে নাই; উহা এবারে তাঁহাকে স্বধর্মাবলম্বী বা সম্পূর্ণ নিজের মানুষ করিয়া লইতে চাহিতেছে। বস্তুতঃ ইউরোপীয়দের লিখিত সালাহ্‌উদ্দীনের নাইটত্বে দীক্ষা-গ্রহণ-কাহিনী তাঁহার খৃস্টান ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস নহে, ইউরোপ তাঁহাকে কত গভীর শ্রদ্ধা করে, তাহারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

ICCDP 317/80—81/3250/1. 6. 1981